ঝরাফুল

হাফিজুর রহমান খাঁন

ইউনিভার্সাল
বুক ডিপো
৫৭-ডি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩

মুদ্রণে : সাধনা সিংহরায়,
কালী প্রেস, ৬৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

চিত্রণে : জীতেন দাসগুপ্ত

গ্রন্থনে : রহমান বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস,
১৩।১।১, পাটোয়ার বাগান লেন (খাদ্রি গলি)
কলিকাতা-৯

স্বত্বায়নে : হাফিজুর রহমান খাঁন

উৎসর্গ

মা'কে—

স্নেহের,

খোকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবার বুঝি বৃষ্টি এল। উহঃ! রাতটা কি ভীষণ অন্ধকার। দুচোখ চেয়েও নিজেকে অন্ধ মনে হচ্ছে। যে দিকে তাকাই শুধু অন্ধকার, আর অন্ধকার। সুইচ বোর্ডটা গেল কোথায়? নাঃ! এই ইলেকট্রিক সাপ্লাই বোর্ডকে নিয়ে আর চলছে না। এখনও বিদ্যুৎ আসেনি। এরকম যদি ব্যবস্থা চিরকাল থাকে তো, দেশটা উচ্ছন্নে যাবে। যাক, যেতে আর বাকিই কি আছে। সবেতেই তো এখন অবনতি। আকাশটাও ভীষণ ডাকছে তো—ঘন ঘন বিদ্যুৎ—আরে, জানালাটা যে খোলাই রয়েছে। রামুটার যদি একটু বুদ্ধি থাকে। দিনরাত কেবল ঘুম আর ঘুম। কিন্তু মিনু; মিনুর কি খেয়াল নেই! আকাশের এ অবস্থা দেখেও পালনের কাছে এই জানালাটা খুলে রেখেছে? হয়তো মনেই নেই। বেচারী হয়তো কাকলীর সোয়েটার নিয়েই ব্যস্ত। বললেই হয়তো আবার অভিমান করে বসবে। ছিটকিনিটাতে কি রাস্ট পড়লো নাকি? খুলতেই চাচ্ছে না।

আহঃ, কতদিন পর বৃষ্টির ঝাপটা লাগলো মুখটায়। না, থাক, জানালাটা খোলাই থাক। এখানে একটু দাঁড়াই বরং। বেশ লাগছে। ছোটবেলায় কত তো এভাবে বৃষ্টিতে ভিজে কাকভেজা হয়েছি আমি আর রফিক। রফিক—এই নামটা মনে পড়লেই সমস্ত অতীতটা যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে। রফিক, রফিক আজ আর এই পৃথিবীতে নেই! চলে গেছে! চলে গেছে আমাদের ছেড়ে! একথা ভাবতেই যেন কান্না পায়। দেখতে দেখতে দশটা বছর পার হয়ে গেল। তখন আমি ব্রীজ এ্যাণ্ড রুফ কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট্ এনজিনীয়ার। আর এখন, এখন আমি চীফ্ এনজিনীয়ার এবং একটা কন্যার বাবা। রফিক আজ থাকলে সেও হয়তো কিছু একটা হত। রফিক...............

হাওড়া জেলার সুন্দর একটা গ্রাম। ঠিক গ্রাম বললে ভুল হবে, শহরের ছোঁয়া কিছু কিছু লেগেছে ওতে। তবুও গ্রামের ঐতিহ্য পুরো-পুরি বর্তমান। গোমতি এই গ্রামের নাম। পাশাপাশি দুই পাড়ার দুই ছেলে। রফিক আর আমি। বয়সে আমি ওর থেকে দু-তিন বছরের বড়। স্কুল জীবনেই আমাদের পরিচয় ঘটে ছিল। আমি তখন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র।

সেদিন পাশের গ্রামের এক স্কুলের সঙ্গে আমাদের স্কুলের খেলা। মাঠে সবাই উপস্থিত হয়েছি। ফুটবল খেলা দেখতে আমার ভাল লাগতো। কিন্তু ভাল খেলতে পারতাম না। তাই আমার কোন স্থান ছিল না সেদিন। দেখলাম, সুন্দর এক বলিষ্ঠ যুবককে। নাম জানলাম, রফিক। এর আগে স্কুলের কোন ম্যাচ আমার দেখা হয়নি। তাই, আজ ওকে প্রথম দেখলাম। স্কুল আওয়ারে দু একবার দেখলেও, মনে রাখার মতো কিছু ঘটনা ঘটেনি। হয়তো বা ভাল করে দেখিইনি। সারাক্ষণ খেলার মধ্যে আমার চোখ যেন ঐ রফিকের উপরেই ছিল। রক্ষণভাগে চীনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। কারও সাধ্য নেই, সেই প্রাচীর ভেদ করে। কেমন যেন ওর প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গেল। ভাবলাম ওর সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব পাতানো যায় তো বেশ হবে। ব্যাস, তারপরের দিনই অফপিরিওডে দেখা করলাম। অনেকক্ষণ কত গল্প, কত আলোচনা করলাম। মনেই হলনা যে, আজ এর সাথে প্রথম এভাবে কথা বলছি। ওকে বাইরে থেকে যতটা কঠিন, যতটা চঞ্চল মনে হত, ভিতর থেকে ও তত সহজ, তত সরল। একদিনেই যেন আমাকে ও আপন করে নিল। এরপর কয়েক মাসের মধ্যে ওর আমার বন্ধুত্ব পাকা হয়ে গেছে। ওদের বাড়ী আমি প্রায়ই যাতায়াত করতাম। লেখাপড়ার দিক দিয়ে উপরে থাকায় আমি ওকে সব সময়ে পড়াশুনার কথা বলতাম। বিশেষ করে পরীক্ষার সময় পিছু লেগে থাকতে হত।

—এই রফিক, দেখ, সামনে তো আমার পরীক্ষা। তোর ও। তা একটু ভাল করে পড়াশুনা কর না। রেজাল্ট একটু ভাল হলে, সবাই ভাল বলবে।

রফিক আমার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বললো—হাঃ, ওসব রেজাল্ট-টেজাল্ট বুঝি না। ওসব তোরা করবি। নভেম্বরে আমার পাখী শিকারের সিজেন্। জানিস, এবছরে একটা Airgun ঠিক করে রেখেছি; মামার। বাবাকে তো বলেই সারা। দুর, খালি পড়া আর পড়া। আচ্ছা, আমার দ্বারা কি পড়াশুনা হয়? বুঝলি, ক্লাস নাইনে, উঠেই ব্যাস, বইপত্তর সব তাকে।

আমি একটু জোর দিয়ে বললাম—কি যা-তা বলিস? সবাই চায় তুই ভাল রেজাল্ট করবি। সবদিকেই তো তুই হীরো। পড়াশুনায় বা হবি না কেন বলতো?

আমার কথা যেন ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না। ও বললো—কই, কেউ তো আমায় পড়াশুনার কথা বলে না; শুধু তুই ছাড়া।

—আরে সবাই জানে তুই সব জানিস। সেইজন্যে কেউ তোকে পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করে না।

কতকটা অবজ্ঞার সুরে রফিক বললে—আচ্ছা, আচ্ছা, সে পরীক্ষার এক সপ্তা আগে দেখা যাবে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মুখে সামান্য হাসি এনে রফিক আবার বলে—এখন চল না, একটা সিনেমা দেখে আসি। আমি একটু অবাক হয়ে বলি—সিনেমা ? এই পরীক্ষার সময়! মাত্র আর এক মাস বাকি যে রে! কবে পড়বি তাহলে ?

—ও তুই দেখবি এক সপ্তায় সব শেষ করে ফেলেছি। ফেল আমি কখনও হইনি, আর হবোও না। তবে জানিস, তোদের ওই সব বড় বড় বই দেখলে আমার ভয় হয়। আচ্ছা যাক, তুই তাহলে যাবিনা, না ? ঠিক আছে।

আমি ওকে বুঝিয়ে বলি—আজ বরং সিনেমায় না গিয়ে……। আমার কথা আর শেষ হয় না। চকিতে ও চঞ্চল হয়ে বলে—চলিরে, পরে দেখা হবে। আমার বাস এসে গেছে।

রফিক ছুটতে ছুটতে বাসে উঠে পড়লো। ওর জীবনটাই যেন এক দুর্বার গতি নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ভয় হয় কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। ওর যা দুঃসাহসীক কাজ।

পরের দিন বিকেল ৪টেয় ওর বাড়ী গিয়েছি। দেখি, ও একমনে কি আঁকছে আর লিখছে।

আমায় দেখে খুশী হয়ে রফিক বললো—আরে তুই, কখন এলি ? বস, দেখ তো কেমন হল ছবিটা। জানিস, আজ বিজ্ঞানের উত্তর-গুলো সব ঠিক করে রাখছি। পরীক্ষার একদিন আগেই সব শেষ করে ফেলবো।

আমি ওকে উৎসাহ দিয়ে বললাম—বেশ সুন্দর হয়েছে। তোর হাতের লেখাটাও কিন্তু সুন্দর। আমার চেয়ে অনেক ভাল।

রফিক যেন কি বলতে যাচ্ছিল। চাচীমা এসে পড়ায় তা বলা

হল না। চাচীমা আমায় দেখে বললো—এই যে বাবা সিরাজ, কখন এলে?

—এই সবে মাত্র চাচীমা। রফিক তো বেশ পড়াশুনায় মন দিয়েছে।

চাচীমা একটু হাসলো। বললো—খেয়াল গেলেই বসে। ওর কোন কাজের সময় নেই।

রফিকের এসময়ে এসব কথা বুঝি ভাল লাগছিল না। তাই ও বললো—মা, ক্ষিদে পেয়েছে। আমাদের দুজনের জন্যে একটু চা—।

চাচীমা বুঝতে পারে। বলে—সে তোকে আর বলতে হবে না।

চাচীমা। ওরফে রফিকের মা। শান্ত, বুদ্ধিমতী এই মহিলা। ওনার সবখানেই যেন একটা আভিজাত্যের ছাপ। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যেন ওনারই ছেলে। রফিকও তাই বলে—মা, আমার চেয়ে তুমি সিরাজকে বেশী ভালবাস কেন? আমার চেয়েও কি ওকে তোমার ভাল লাগে?

চাচীমা বলে—দূর পাগল, আমার সবাই ভাল।

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠতাম। মনে মনে আমার খুব ভাল লাগতো। ভাল লাগতো ওদের সবটাই। সকলের মধ্যে যেন একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাব। সুন্দর দোতলা বাড়ী, তার সামনে মাঠ। একধারে ফুলের বাগান, অন্যদিকে লন মত। বাগানে নানারকম দেশী বিলেতী ফুলের গাছ। ওর বাবা ছিলেন বিজনেস্ ম্যাগনেট। পয়সার অভাব নেই। রফিককে ওর বাবা অত্যন্ত ভালবাসতেন। ওর মটর সাইকেলটা দেখলে মাঝে মাঝে চুরি করার ইচ্ছা যেত। সব সময় ঝকঝকে তকতকে। সবচেয়ে ভাল লাগতো রফিকের পড়ার ঘরটা। ঐ ছেলে যে এভাবে নিজের জায়গাটা সুন্দর করে গোছগাছ করে নিয়েছে, তা ভাবতেই অবাক লাগে। ওর সবটাতেই যেন সুন্দরের ছড়াছড়ি। যদিও পড়াশুনা ভাল করে

করে না, তবুও বইগুলোর প্রতি ওর কি যত্ন। কি মায়া! মাঝে মাঝে আমারই হিংসা হত। আমি যদি একটু সুন্দর করে কিছু করতে পারতাম!

সেবারের পরীক্ষাতে ও পাশ করেছিল; কিন্তু ইংরাজীতে ফেল। কিছুদিন পরে আমিও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিলাম। ওর আর পড়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ওর বাবা ওকে পড়াবেনই। এমনিতে ওর বাবা ওকে ভালবাসলেও শাসন করতে কম করেননি। রাশভারী, বিরাট ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে রফিক কোনদিন কোন কাজে না বলেনি। সুতরাং ইচ্ছা না থাকলেও ওকে পড়তে হবে। ওর ইচ্ছা ও কলা নিয়ে পড়বে। কিন্তু আমার এবং ওর Private মাষ্টারের জোরে ওকে বিজ্ঞান নিতে হল।

সেদিন তাই যখন ও বললো—একে তো আমার দ্বারায় আর লেখাপড়া হবে না, তাতে আবার বিজ্ঞান নেওয়ালি। দেখবি এবার নিশ্চিত গাড্ডু।

আমি তখন ওকে অভয় দিয়েছিলাম। মনে মনে ভেবেছিলাম ওর জীবনে একটা পরিবর্তন দরকার। ওর এই প্রতিভাকে এভাবে নষ্ট করতে দেওয়া উচিত না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন সন্ধ্যায় দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছি। রাস্তায় স্কুলের সেক্রেটারি জনাব রসিদ আলির সাথে দেখা। রফিকের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু আমাকে কথা বলতেই হল।

—কেমন আছেন চাচাজী? আপনি কবে দিল্লী থেকে ফিরলেন? আপনি M. P. হওয়ায় আমরা সত্যিই আনন্দিত। রসিদ সাহেব একটু খুশী হয়ে বললেন—বেশ বাবা, বেশ। তারপর তোমার রেজাণ্টের খবর কি?

—এইতো আসছে মাসে বের হবে। আপনার সেই—"Travelling is a part of education" রচনাটা এবারের পরীক্ষায় এসেছিল। আপনি যেভাবে লিখে দিয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই লিখেছি।

—আচ্ছা বাবা, তোমরা যাও। আমায় একবার হেডমাষ্টারের বাড়ী যেতে হবে।

সেক্রেটারি যাচ্ছেন হেডমাষ্টারের কাছে। রসিদ সাহেবের যে কি প্রয়োজন, তা বোধহয় সবায়েরই জানা। তবুও সবাই নীরব। কেন জানি না। তবে একটা কারণ আছে। সেটা বোধহয় এই যে, উনি যতটুকু করছেন সেটাই ভাল। ভাল না হলেও হচ্ছে তো! কিন্তু স্কুলের অবনতির জন্যে যে কত ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা কেউই ভাবে না। ভাববার সময়ই নেই কারও! চলছে, চলবে। এটাই বুঝি নিয়ম হয়েছে। ভাল মন্দের কোন বিচারই নেই। বিচারের কোন প্রশ্নই আজ নেই। অন্যায়ের তুলনায় ন্যায় যেখানে অতি তুচ্ছ, সেখানে ন্যায়ের মাথা কখনও উঁচু হতে পারে না। এটা স্বাভাবিক, চিরন্তন সত্য।

আমি চুপচাপ হাঁটছি দেখে রফিক বললো—অত কি ভাবছিস একমনে। কোন গল্পের প্লান করছিস নাকি? তোর আবার লেখার হাত আছে তো!

ওর কথায় আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। আমি বললাম—না, না। এমনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। চল মাঠের দিকে খানিকটা ঘুরে আসি।

—আচ্ছা সিরাজ তোর ঐ "Travelling" কথাটার মানে কি বলতো? শব্দটা বিটকেল, কখনও শুনিনি বোধহয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম—বলিস কিরে! এতো একটা ক্লাস ফোরের ছেলে জানে। নাঃ, সত্যি তোর দ্বারা লেখাপড়া সম্ভব না। তুই পড়াশুনা সম্বন্ধে এতটা অমনোযোগী, একথা ভাবতেই আমার লজ্জা লাগছে। আরে Travelling শব্দটার অর্থ হল ভ্রমণ। কি, তোর মুখটা অমন পাংশু হয়ে গেল কেন? রাগ করলি নাকি? আরে ও কিছু না। একটু পড়াশুনা করলেই জানতে পারবি। চল, ঐ খোলা জায়গাটায় গিয়ে বসি।

আমার কথাগুলো শুনে রফিক একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বললো

—নারে, আমার মাথাটা ধরেছে। আমি এখন বাড়ী যাব। পরে আবার গল্প করা যাবে।

এর পর রফিক চলে গিয়েছিল। সেদিন ভাবতেও পারিনি যে, এই সামান্য কথায় ওর এত পরিবর্তন আসবে। এ যেন অমাবস্যার আকাশে পূর্ণিমা চাঁদের আগমন।

পরের দিন সকালে ওর কাছে গিয়েছিলাম। ও তখন পড়ছে। আশ্চর্য, আজকের পড়ার মধ্যে ওর কত আগ্রহ; কত মনোযোগ। আমার উপস্থিতি ও বোধ হয় টেরই পেল না। আমিও ওকে ডিস্‌টার্ব না করে ওখান থেকে চলে এলাম।

আমার পরীক্ষার ফল বের হল ঠিক সেই সময়ই। Second division-এ পাশ করলাম। হাতে তখন সময় ছিল না। Engineering-এ ভর্তি হওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ভাল রেজাল্ট না হওয়ায় ভর্তি হতে বেশ বেগ পেতে হল। Admission টা হয়তো হতোই না, যদি না বাবার সুপারিশের জোর থাকতো। আমাদের সংসার বর্তমানে নুয়ে পড়লেও এক সময়ে আমাদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। বাবা একজন সরকারী গেজেটেড অফিসার। বড় বড় লোকের সাথে ওনার পরিচয়। ছোট বেলায় দেখতাম, কত বড় বড় লোক কোট টাই পরে বাবার সাথে বাড়ীতে আসতেন। তাছাড়া আমাদের একটা সাইট বিজনেসও ছিল। আজ বিজনেস্ বলতে আর কিছুই নেই। বাবার একা রোজগারে এতবড় সংসারটা চালানো বেশ শক্ত। কেবল মায়ের চেষ্টাতেই আজও কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। মা আমার অত্যন্ত হিসাবী। বাবা অনেক সময় মুষড়ে পড়লেও মা বলতো—"কি অত ভাবছো, এই দেখ, খোকা আমাদের বড় হয়ে গেছে। আমাদের আর কিসের ভাবনা! তুমি কিন্তু খোকার ভর্তির ব্যাপারটা আগে থেকেই ঠিক করে রেখ।" সুতরাং Admission আমার হয়েছিল।

প্রায় পাঁচ-ছদিন হল, আমি রফিকদের বাড়ী যাইনি। বৈকালে তাই বেরিয়ে পড়লাম। দূর থেকে দেখি, ও ব্যাটমিন্টন খেলছে ওরই এক ক্লাস ফ্রেণ্ডের সঙ্গে। সারা শরীরটা ঘামে ভিজে গেছে ওর। খেলার তালে তালে শক্তি সবল পেশীগুলো যেন নাচছে। কোন কষ্টের ছাপ ওর মুখে নেই। অন্যদিকে ওর বন্ধু তখন হাঁফাচ্ছে। ওদের খেলা হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলতো যদি না আমি বলতাম—অনেক হয়েছে। এবার থাম। কখন থেকে যে দাঁড়িয়ে আছি; খেলা আর শেষ হয় না।

—সিরাজ তুই। ভালই হল। চল বাড়ীতে। তোর সাথে আমার বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিই।

পরিচয় পর্ব শেষে কিছু জলযোগ করে রফিকের বন্ধু বিদায় নিল। আমরা দুজনে ওদের ওপরের ঘরে গিয়ে বসলাম।

আমাকে একটু ব্যঙ্গ করে রফিক বললো—কিরে, Engineering-এ chance পেয়েই যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেছিস মনে হয়! একদিন নয়, দুদিন নয়, একেবারে ছদিন উধাও। ব্যাপার কি বলতো? জাতে উঠলি নাকি?

ওর এই কথাগুলো আমায় একটু লাগলো। আমি বললাম—তা কি করে হয়! আমি যদি জাতে উঠি, তোকে কি ছেড়ে যাব! তুই আমায় ভুল বুঝিসনি।

—দুঃখ পেলি বোধহয়? নারে, আমি ঠাট্টা করলাম। জানিস সিরাজ, ভাবছি, আমি যদি ডাক্তার হতে পারি। সত্যিরে, এ'কদিন আমার মন বলছে যে আমি ডাক্তার হতে পারবো। সে শক্তি আমার আছে। বাবারও তাই ইচ্ছে।

ওর এই কথায় আমার মন দুলে উঠলো। আগ্রহ ভরে বললাম—সত্যি বলছিস! তোর ইচ্ছা করছে? আমি বলছি তুই ভাল করে পড়, নিশ্চয় ডাক্তার হবি। বেশ মানাবে আমাদের দুটিতে।

নিজের আত্মবিশ্বাসে জোর দিয়ে ও বলে-বেশ, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। আজ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি আমি করবো না। দেখে নিবি, আগামী বাৎসরিক পরীক্ষায় stand আমি করবোই।

স্ট্যাণ্ড ও করেছিল। সতের রোল নাম্বার থেকে সেকেণ্ড। তখন সকলের দৃষ্টি রফিকের ওপর। সব দিকটাই আজ পূর্ণ। বন্ধু হিসাবে রফিক তখন লোভনীয় বস্তু। প্রশংসার পঞ্চমুখে রফিক তখন দুলছে। আমিও মনে মনে খুব গর্বিত হয়েছিলুম। সেদিন খোদাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারিনি। কিন্তু এ উন্নতির পাঁজরে যে একটা কালো কাট বাঁসা বাঁধছে তা তখন জানিনি। জানিনি, দীপ তার মোহময় জ্যোতি ছড়িয়ে পতঙ্গকে নাশ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

তখন শীতকাল। দেখতে দেখতে আমার দুটো বছর পার হয়ে গেছে। রফিকের এটা শেষ বছর। ও এবার final পরীক্ষা দেবে। রাত তখন আটটা। বেশ শীত পড়েছে। আকাশের কোথাও একটা তারা নেই। বাবা, মা, ভাই বোনেরা তন্দ্রায় বিভোর। আমি বাইরের ঘরে থাকি। কেমন যেন ভাল লাগছিল না। ভাবলাম, রফিকের কাছে একটু গল্প করে আসি। দূর থেকে জানালার ফাঁক দিয়ে ওর পড়ার ঘরের আলো দেখতে পেলাম। কাছে এসে মনে হল। আলোটা বেশ জোরেই জ্বলছে। হয়তো লিখছে, নয়তো পড়ছে। ভাবলাম, ওকে হঠাৎ অবাক করে দেব। পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে মারলাম এক ধাক্কা। কিন্তু ও কি? ও যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলো।

এ রকম তো অনেক বারই করেছি। ওটা কি ওর হাতে? লুকোবার চেষ্টা করছে?

—কিরে অমন হ্যাঁ করে আছিস কেন? ভয় পেলি নাকি?

রফিক তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে। কাঁপা গলায় ও বললো—না ভয় পাব কেন? কিন্তু তুই—ই। এত রাতে......।

—তোর হাতে ওটা কিরে? দেখি, কি লিখেছিস। কবিতা নয়তো? ও আমায় এড়িয়ে যেতে চায়, বলে —ও কিছু না। এমনি ছবি আঁকছিলাম। কি দরকার বল?

এমন করে ও কথাগুলো বলছিল যেন আমি ওর কাছে অপরিচিত। বিশেষ প্রয়োজনেই যেন এত রাতে সাহায্য চাইতে এসেছি। আমার কিন্তু লক্ষ্য ছিল ওর হাতের মধ্যে লুকান সম্পদের উপর।

আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। আমি আবার বললাম—হাতের মধ্যে ওটা কি লুকিয়ে রেখেছিস?

বার বার এক কথা জিজ্ঞেস করায় ও কিছুটা স্বাভাবিক হ'ল। বললো—দেখ আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। তুই আমার প্রাণের বন্ধু। তোকে আমি আজ সব বলবো। দোহাই কিন্তু, কেউ না যেন জানে। জানলে বাঁচা মুস্কিল হবে।

আত্মসম্মান বোধ এবং চক্ষুলজ্জা ওর গোড়া থেকেই ছিল। কিন্তু এতটা আশা করিনি। বললাম—ভয় নেই দোস্ত, আমি কাউকে বলবো না। দেখি জিনিসটা আমার হাতে দে।

—উঃ, এ যে দেখছি প্রেমপত্র! তাহলে ডুবে ডুবে জল খেতে শিখেছিস, এ্যাঁ? তা ভায়া তোমার এ লায়লাটি কে? ভয় নেই; কোন কথা প্রকাশ পাবে না।

—তুই বস না, সব বলছি। রীণা-কে চিনিস না? ঐতো তিন-তলা বাড়ীর মেয়েটা। জানিস, সবটা যেন কেমন অদ্ভুতভাবে হয়ে গেল। আমি এখন কি করি বলতো?

রীণাকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনি। রফিকদের পাশের বাড়ী বললেই চলে। বেশ ধনী লোক ওরা। বাবা, মা, জীবিত। বড় বড় সব ভাই বোন। সবারই বিয়ে, ছেলেপুলে হয়ে গেছে। রীণাই এদের সবের ছোট। বাড়ীতে রীণার আদরের সীমা নেই।

লাজুক অথচ চঞ্চল প্রকৃতির এই মেয়েটার দিকে বাড়ীর সবায়ের কেমন যেন একটা মায়া, একটা ভালবাসা।

রফিক আর রীণার প্রেমের ব্যাপারে হঠাৎ তখন কিছু বলতে পারিনি। শুধু বললাম—কি আর করবি চালিয়ে যা।

কলেজ জীবনের কয়েকটা বৎসরের মধ্যেই আমি দু'তিনটে জোগাড় করে ফেলেছিলাম। ছোটবেলা থেকে এদিকটায় আমার প্রচণ্ড হাত। রফিক তখন এসব থেকে অনেক দূরে। কোন অপরি-চিত মেয়ে সামনে পড়লেই ও যেন ছিটকে সরে যেত। আমি বলতাম—"তুই একটা আস্ত বুদ্ধু। তোর দ্বারা প্রেম-ট্রেম হবে না।" সেই রফিকের দ্বারাই আজ প্রেম হয়েছে। প্রেম করেছে পাড়ার সেরা মেয়ে রীণার সঙ্গে। রীণার রংটা সামলা হলেও সে ছিল সুন্দরী। সুন্দর মুখশ্রী। তাতে পটল চেরা চোখ। ফুলের পাপড়ির মত ঠোঁট দুটো যেন আরও সুন্দর করে তুলেছে মুখটাকে। বুকের নিটোল পয়োধর যুগল যেন উত্তাল পাহাড়ের শৃঙ্গ। হাতে গড়া প্রতিমার মত ওর তনুশ্রী। নিচের নিতম্ব সবাইকে ভীষণভাবে প্রলুব্ধ করে। যেন রূপ ঠিকরে বের হচ্ছে সেথা থেকে। রীণার সম্পর্কে অনেকের কৌতূহল থাকলেও ও ছিল দুর্লভ। আজ সেই দুর্লভকেই সুলভ করেছে রফিক্।

সময়ের সাথে সাথে মানুষের তথা সারা পৃথিবীর রং বদলায়। এ যেন প্রকৃতির বহুরূপীতা। এ পরিবর্তনের রোধ কেউই ঠেকাতে পারে না। স্বয়ং খোদার হাতে এর নিয়ন্ত্রণ। মানুষ বাল্য থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যৌবনে আসে। বয়সের তাগিদে মন হয়ে ওঠে চঞ্চল, বুভুক্ষু। মনের চাহিদা মেটাতে সে চায় একটা আশ্রয়, একটা অবলম্বন। যে পায় সে ভাগ্যবান, যে না পায় সে অভাগা। রফিকের এ পাওয়ার ব্যাপারে তাই আমার পূর্ণ সমর্থন ছিল। ছিল আমার আন্তরিকতা। ওকে সেদিন সাহস দিয়ে বলেছিলাম—প্রেম

একটা মহৎ জিনিস। তুই মোটেই ভয় পাসনি। তুই তো আর কাউকে খুন করিসনি! প্রেম করেছিস, এই যা।

রফিক বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে শুনছিল আমার কথা। ওকে মনে হল ও যেন একটা বাচ্চা ছেলে। একমনে গুরুজনের উপদেশ শুনছে। হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—এ ব্যাপারে কিন্তু তুই আমাকে সাহায্য করবি।

ওকে অভয় দিয়ে বললাম—সে আর বলতে। তোকে আমি মজনু করে ছাড়বো।

রাত অনেক হয়েছিল। বাড়ী এসে নিজের আস্তানার ঢুকে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আসছিল না। রীণার বড় ভাই কামাল সাহেবের কথা মনে পড়ছিল। অত্যন্ত তীক্ষ্ণদর্শী এবং বুদ্ধিমান লোকটা। চাণক্যের মত নখদর্পণে তাঁর কূটবুদ্ধি। লোকটাকে আমার মোটেই ভাল লাগতো না। সবসময় ওনার শ্যেনচক্ষু যেন সতর্ক প্রহরীর ন্যায় ঘোরাফেরা করতো। রফিক যদি এই লোকটার খপ্পরে পড়ে যায়, তো মুশকিল। একেবারে নাজেহাল করে ছাড়বে। তাছাড়া রীণাদের বাড়ীর সবায়ের একটা আত্মগর্বী ভাব ছিল। মোটকথা পয়সা থাকলে লোকের যা হয় আর কি। পাড়ার মধ্যে এ বাড়িটার বেশ একটা দাপট ছিল। পয়সার পূজো করাই আজকের মানুষের ধর্ম। তাই অনেকে এদের তাঁবেদারি করতেও কম করেনি। এদের তুলনায় রফিকদের অবস্থা ভাল থাকলেও তার প্রকাশ ছিল না। ছিল না তার দাপট। বড় হয়েও বড় না হওয়া এরকম একটা মনোভাব রফিকের বাবার ছিল। রফিক ওর বাবার গুণটাই পেয়েছে। রফিককে রীণাদের বাড়ীর সবাই বেশ ভালবাসতো। তাইতো ও মাঝে মাঝে বলতো—জানিস সিরাজ, তোরা সবাই রীণাদের খারাপ চোখে দেখলেও আমার কিন্তু ওদের বেশ ভাল লাগে। আমাকে ওরা প্রচুর স্নেহ করে।

রফিকের এই মনোভাবকে আমি কোনদিনই মেনে নিতে পারিনি। একটা দ্বন্দ্ব আমার মনে সব সময়েই ছিল। এ ভালবাসা আন্তরিক, না তেলা মাথায় তেল দেওয়া? যুক্তি দিয়ে কোনদিনই আমি এর সত্যমূল্য যাচাই করে দেখিনি। প্রয়োজনও পড়েনি।

তারপর রফিকের পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে, আমারও। এখন কেবল পড়া আর পড়া। সময় পেলে ওদের বাড়ী গিয়ে দেখতাম ও পড়ছে। কেউ পড়বে আমি ঘুরবো এ যেন আমার ভাল লাগতো না। আমি বলতাম—"চল রফিক, বৈকালটায় একটু হাওয়া খেয়ে আসি।"

আমার কথায় অনেক সময় সম্মতি জানিয়েছে ; অনেক সময় নারাজ হয়ে বলেছে—নারে, এখন আমার সময় নেই। অনেক পড়া বাকি।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে সারারাত তুমি পড়ো। একটু জিরিয়ে না নিলে শরীর খারাপ করবে যে।

রফিক ওর টেবিলের দেরাজ খুলে একটুকরো কাগজ বের করে। এলোমেলো লেখা। দেখে মনে হয়, কোন মেয়েলি হাতের হবে বুঝি। কাগজটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ও বলে—এই দেখ, রীণা কি লিখেছে। আমাকে ডাক্তার হতে হবে।

একটু হেসে আমি বললাম—বইয়ের পাতায় একাগ্রতার কারণটা এবার বুঝলাম! ওকে খুব ভালবেসে ফেলেছিস্, না? যাক্ তাহলে, এক ঢিলে দুটো পাখি মরবে। তোর বাবার ইচ্ছাও পূরণ হবে, সেই সঙ্গে রীণারও ; কি বলিস? তা না হয় হল! এখন একটু ওঠ দেখি, ঘুরে আসি।

রফিক এতক্ষণ কি ভাবছিল। আমার চোখে চোখ রেখে ও বললো—আচ্ছা সিরাজ, আমি যদি ডাক্তার হতে না পারি ; রীণার সঙ্গে যদি

আমার বিয়ে না হয়; তাহলে কি হবে? না, তাহলে তো আমার বাঁচা সম্ভব না।

বিরক্ত হয়ে আমি বলি—তুই দেখছি নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই ঠিক করে ফেলছিস। যত সব বুজরুকি। নে ওঠতো।

সেদিন রফিকের সেই কথাটাকে বুজরুকি বললেও, আজ তার সত্যতা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। অনুভব করছি তখনকার প্রতিটি ক্ষণকে। তখন এটা বুঝিনি যে, কথাটা ওর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসছে। সেদিন তাই তার মূল্য আমি দিইনি। মূল্য দেওয়া তখন সম্ভব ছিল না। আমি যদি অসাধারণ হতাম, তাহলে হয়তো কথাটার তাৎপর্য্য বুঝতে পারতাম। আঁকতে পারতাম আগামী দিনের ছবি। কিন্তু আমি তো একটা সাধারণ ছেলে। সাধারণের মাঝেই আমার জন্ম। এ বিষয়ে অসাধারণত্ব যেটুকু ছিল, সেটা রফিকেরই। একথাটা বুঝতে আমার অনেক দেরী হয়ে গেছে। দেরী হয়ে গেছে বলেই তার মাশুল আমায় দিতে হয়েছে পদে পদে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রফিকের পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন হাতে তার অফুরন্ত সময়। গল্পে আর আড্ডায় দিন কাটাতে থাকে ও। রাতে কিন্তু রফিক আলাদা একজন—হাতে কলম নিয়ে ভাবতে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আমি ওকে প্রায় জিজ্ঞেস করতাম—কি অত লিখছিস এক মনে ?

আমার কথার জবাবে ও বলতো—কবিতা। রীণাকে নিয়ে লিখছি।

পিতল কাঁসার মত প্রতিভাকে যদি ঘসা মাজা না যায় তো তার গায়েও এক পুরু ময়লা জমে। একথা সেদিন বুঝেছিলাম—রীণাকে ভালবেসে তাহলে ভালই হয়েছে বল ?

লিখতে লিখতেই ও বলে—তা বলতে পারিস। জানিস, ওর কথা মনে পড়লেই কবিতা লিখতে ইচ্ছা করে। কবিতা লেখার শেষে ভেবেই পাই না, কেমন করে তা সম্ভব হয়েছে।

—তা বেশ তো। একটার পর একটা লিখে যা। শেষে সব কটা

ছাপিয়ে আমার নামে উৎসর্গ করবি। আমি তোর প্রেমের সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকবো।

কবিতা যে সবই ভাল লিখতো, এমন না। তবে লিখতে লিখতেই তো লেখা ধার হয়। ওর কতকগুলো কবিতা তাই চমকে দিতো আমায়। উৎসাহ যোগাতেই তাই কথাগুলো বলেছিলাম। মনটাকে তখন ও লেখার মাঝে ঢেলে দিয়েছে। অবচেতন মনে শুধু একটা কথাই ও বলে।—হুঁ!

মাঝে মাঝে ওর এই "হুঁ" টা আমার বড় খারাপ লাগতো। যেন ও আর এ জগতে নেই। গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলতাম—হুঁ কিরে?

মুখটা তুলে ছোট্ট একটা উত্তর দিতো—সে এখন অনেক পরের কথা।

লেখার সময় ওকে বিরক্ত করার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। আমি চলে যেতাম। ও পিছু ডাক দিয়ে বলতো—কিরে চলে যাচ্ছিস। রাগ হল তো?

—না, আমি বরং তোর কবিতাটা পরে দেখবো। ইচ্ছা না থাকলেও আমি চলে আসতাম। পরের দিন নিজেই ও আবার ওর লেখা দেখাতো। জানতে চাইতো, কেমন হয়েছে?

উৎসাহ দিয়ে বলতাম—তুই সব্যসাচী। এক হাতে বিজ্ঞানচর্চা করছিস; অন্য হাতে সাহিত্য।

একদিন হঠাৎ ও হন্তদন্ত হয়ে আমার বাড়ী এল। আমি ভাবলাম, কোন কবিতা টবিতা লিখে দেখাতে এসেছে বোধহয়। জিজ্ঞাসা করলাম—কিরে, এই দুপুরে। কোন লেখা আছে নাকি?

এর আগে ও এভাবে আমার কাছে অনেকবারেই এসেছে। অনেক লেখা দেখিয়েছে। মানুষ যখন কোন কিছু সৃষ্টি করে, এমনিতেই

তার মনটা তখন আনন্দে কেঁপে ওঠে। হয়তো তাই, ও আমার কাছে ছুটে আসে বারে বারে।

নিষ্প্রভ চোখে চঞ্চল হয়ে রফিক বলে—মুশকিল হয়ে গেছে সিরাজ। তোর ঘরে চল, বলছি।

ওর এহেন ব্যবহারে আমি চমকে উঠলাম। অজানা এক আতঙ্ক সারা মন ছেয়ে ফেললো। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলাম ওকে। বললাম—কি হয়েছেরে? কি বলবি?

গম্ভীর একটা নিশ্বাস ফেলে ও বললো—গতকাল রীণার সাথে আমার নিভৃতে কথা হয়েছে। যখন ওদের বাড়ীর সবাই নিচের ঘরে নাটক শুনছে, তখন আমি ওপরে গিয়েছিলাম। রীণা সেখানেই ছিল। আমাকে দেখে ও ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো। প্রথমটা আমি অবাক হয়েছিলাম। স্নায়ুর চাপে বুকটা ধকধক করছিল। বললাম—কি হয়েছে রীণা, কাঁদছো কেন?

মুহূর্তে রীণা আমার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বললো—আমাকে তুমি কবে বিয়ে করবে?

আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না সিরাজ। এই মুহূর্তে এরকম কথা আমি আশা করিনি। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। দেখলাম, ওর চোখ দুটো, অপলক দৃষ্টিতে আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় রয়েছে। কিন্তু এর উত্তর আমার তখন জানা ছিল না। বিয়ের কথা যে আমি ভাবিনি তা নয়। আমি বললাম—এত তাড়া কিসের রীণা? তোমার কি কোন অসুবিধা আছে?

খানিক উত্তেজিত হয়ে অভিমানের সুরে রীণা বলে—না, না, এই আমাদের ঠিক সময়। এরপর বুঝি বিয়ে আমাদের সম্ভব হবে না।

আমি ওকে বুঝিয়ে বলি—ছিঃ; রীণা তুমি এত অধৈর্য হয়ে পড়ছো কেন? প্রথমে ডাক্তারীতে Admission নিয়ে নিই।

তারপর তোমার আমার বাড়ীর মতামত আদায় করি। আমরা তো এক্ষুণি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি না।

আনত চোখে ও বললো—আমার বাড়ীর মতামত তুমি কোনদিনই পাবে না।

সিরাজ, আমার আর বলার মত কিছুই ছিল না। ওর ও উত্তেজনা তখন প্রশমিত হয়েছে। আদর করে ওর মুখটা কাছে এনে ওর ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে বললাম—তোমাকে আমার রাণী করবোই।

আবেগে আর খুশীতে ওর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠেছিল। দুহাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—তোমার ইচ্ছাই আমার সব।

কিন্তু সিরাজ, রীণার চোখে মুখে এক দুঃসাহসিকতার ছাপ আমি দেখেছি। মুহূর্তে উত্তেজনা কমলেও ও মনে মনে যেন কি ভেবে নিয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে কিছু একটা করে বসবে না তো?—আমাকে যেভাবে জড়িয়ে ধরেছিল, মনে হচ্ছিল, এ যেন বিদায় লগ্নের শেষ আলিঙ্গন।

কথাগুলো বলায় অস্বাভাবিকতা থাকলেও আমার কাছে ওদের প্রেমের গভীরতা যেন পোষাক খুলে দাঁড়াল। একটু নিশ্চিন্ত হলাম। মনে মনে একটু হাসলামও। ও যেভাবে এসেছিল, যেন কোথাও কোন একটা প্রলয় হয়েছে। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—তুই একেবারে হাঁদারাম। আরে এটা বুঝলি না, রীণা তোকে পরীক্ষা করলো। এরকম কত পরীক্ষা আমায় দিতে হয়েছে। তা বলে; তোর মত আমার অবস্থা হয়েছি কি? অতো নার্ভাস হলে প্রেম করা যায় না। বুঝলি।

রফিক আমার কথায় যেন ঠিক বিশ্বাস খুঁজে পায় না, বলে—না সিরাজ, আমি নার্ভাস হচ্ছিনে। তুই বুঝবি না, আমি ওকে কত

ভালবাসি। ও কোন দুঃখ পাক, এটা আমি মোটেই চাই না। আচ্ছা, মাকে একবার বলে দেখবো ?

আমি ধমক দিয়ে বলি—মোটেই না। তুই শেষে দেখি একটা খ্যাপা হয়ে গেলি। আরে বন্ধু, এখন বিয়ের কথা বললে, লোকে যে তোকে বিয়ে পাগল বলবে। প্রথমে তোর পরীক্ষার ফল বের হোক, Admission নে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়া, তারপর বিয়ে। বীণার কথা ভাবছিস তো! বীণা সত্যিই যদি তোকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাহলে, সে তোর অপেক্ষায় থাকবে।

এবারে রফিক একটু সাহস পেয়ে বললো—সত্যি বলছিস? তোর কথাগুলো শুনে যে কি আনন্দ হচ্ছে!

আচ্ছা আমি এখন আসি তাহলে। বৈকালে তুই যাস না, আমার ওখানে।

—যাব। কিন্তু একটু চা খাবিনে?

—দুপুরে চা আমার মোটেই ভাল লাগে না। চলি।

বৈকালে ওদের বাড়ী আমি গেলাম। দলুজের সামনে অনেক লোকের ভিড়। রফিককে দেখলাম, সেখানে হাত নেড়ে কি সব বোঝাচ্ছে। কাছে গিয়ে বুঝলাম, পার্টি পলিটিক্সের ব্যাপার।

সামনে ভোট। মাত্র তিনটে মাস বাকি। তারই প্রস্তুতি চলছে দিকে দিকে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়। তারই সাড়া পড়েছে আমাদের এই গোমতি গ্রামে। চিরকালই কংগ্রেস এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। তা বলে, বামপন্থীর সংখ্যাও খুব কম ছিল না। আমার বাবা কংগ্রেসী। পার্টির সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে একজন। ভোটের সময় তিনি প্রচুর খাটতেন। পার্টির কাজে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিতেন! পার্টি পলিটিক্সের ব্যাপারে রফিকের বাবা কোনদিনই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি। তবে চিরকাল তিনি কংগ্রেসকেই ভোট দিয়ে আসছেন। রফিকের বাবার

এই নীতিটা আমারও খুব ভাল লাগতো। এতে কোন শত্রু পক্ষের সম্মুখীন হতে হত না। মাঝে মাঝে দেখা যেত, শিয়াল কুকুরের হিংসা হিংসী। পার্টি নিয়ে গ্রামের লোকেরা কেন যে এসব করে, বুঝতাম না। ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি, মারামারি। মাঝে মাঝে ভাবতাম, এবুঝি সম্মানের লড়াই, স্বার্থের লড়াই। আসলে কিন্তু কোনটাই না। পার্টির কাজে নিজের স্বার্থ থাকে না। থাকে দেশের স্বার্থ, জাতীর স্বার্থ, ভবিষ্যতের স্বার্থ।

রফিকদের পাড়ায় দুতিন ঘর মাত্র কংগ্রেসী। বাকী সব বামপন্থী দলের সমর্থক। রীণাদের ব্যাপারটা একটু স্বতন্ত্র। যদিও তারা আজ বামপন্থী সমর্থক; এককালে রীণার বড়দা, কামাল সাহেব, অঞ্চল কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। সে প্রায় সাত-আট বছর আগেকার কথা। পার্টির মিটিংএ উগ্রপনা করায় পার্টির লোকে তাঁকে বরখাস্ত করে। চ্যালেঞ্জ দিয়ে সেদিন চলে এসেছিলেন কামাল সাহেব। তারপর থেকেই বামপন্থী দলে নাম লেখান। এতবড় একটা অপমান হওয়া সত্ত্বেও, এখনও উগ্রপনা তাঁর কমেনি—বরং কিছু বেড়েছে।

"ষোল আনার জমিতে পার্টির কোন ফ্লাগ তোলা চলবে না," বেশ জোর দিয়েই বলেন গফুর সাহেব।

গফুর সাহেব রফিকের বাবার চাচাতো ভাই, অর্থাৎ রফিকের বড় চাচা। তাঁরই সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে লোক সমাগম, রফিক এবং আমার উপস্থিতি।

কামাল সাহেব চীৎকার করে বললেন—ফ্লাগ আমরা তুলবোই; এতে কে কি করতে পারে দেখা যাক!

এ অন্যায়। অন্যায়কে প্রশ্রয় রফিক কোনও দিনই দেয়নি প্রতিবাদ করে বলেছিল রফিক—ঠিক আছে, আপনারা যদি ফ্লাগ তোলেন; আমরাও তুলবো। আমাদেরও এতে অধিকার আছে।

গফুর সাহেবের ফ্যামিলি রফিকদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই একটা মাত্র লোক, গফুর সাহেব, যাঁর কথা রফিকের বাবা কোনদিনই অমান্য করেননি। পরস্পর পরস্পরের ভাই হলেও, ওঁরা ছিলেন দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। গফুর সাহেব রফিকের বাবার থেকে বয়সে কিছু বড় হলেও, দুজনের উপস্থিতিতে সেটা ধরা পড়তো না। রফিককে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন।

সেদিন হয়তো রফিক ওসব কথা বলতে চায়নি। চায়নি নিজেদের মধ্যে একটা দল গড়তে। তবুও তার সম্মানে ঘা লেগেছে। পিতৃতুল্য চাচাজী, গফুর সাহেবের সম্মান বাঁচাতে, একথা তাকে বলতে হয়েছে বোধ হয়।

তারপর দিন গেছে। উভয় পক্ষের ফ্লাগ উঠেছে। ঝগড়ার মিমাংসা হয়েছে। কিন্তু তবুও মনের মধ্যে বিভেদ একটা থেকে গেছে। রফিক কিন্তু ওসবের ধার ধারতো না। প্রাণ খুলে মিশতো সবার সাথে। রীণার সাথে। ওদের বাড়ির সাথে। ওর মনটা তখন ঐ পচা, গন্ধময়, নোংরামী থেকে অনেক দূরে। মনে হত, পবিত্র প্রেম ; ভালবাসায় ওর মনটাকে তখন ছেয়ে ফেলেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দু'তিন দিনপর রফিকের হায়ার সেকেণ্ডারীর রেজাল্ট বের হল। পাশ করেছে। স্কুলের সকলের উপরে ওর রেজাল্ট। কিন্তু সেকেণ্ড ডিভিসন পাওয়ায় ওর মনটা খুব খারাপ। এটা ওর দোষ না। যে পরিবেশ থেকে ও লেখাপড়া করেছে, সেকেণ্ড ডিভিসন ছাড়া সেখান থেকে বেশী কিছু আশা করা যায় না। তবুও রীণা খুশী। আমি খুশী। খুশী আরো সবাই। এই খুশী নিয়েই সে রীণার কাছে গিয়েছিল। বলেছিল তার মনের কথা।

—রীণা, তুমি খুশী হওনি?

—অভিমানের সুরে রীণা বলে—আমি খুশী হলেই বা কি! আমার খুশীতে তোমার কিছু এসে যায়?

রীণার একথা যে অভিমানের, রফিক তা বুঝেছিল। অর্থাৎ খবরটা তাকে তাড়াতাড়ি জানান হয়নি। নিজের দোষ এড়াতে রফিক বললো—এই রীণা, তুমি রাগ করেছো? দেখ না, সকালে বন্ধুরা কিছুতেই ছাড়লো না। জান, তোমার জন্যে একটা সুন্দর

জিনিস এনেছি। তোমার নিশ্চয় পছন্দ হবে। রীণার অভিমান তখনও পড়েনি। মুখ ঘুরিয়ে বলে—ছাই হবে। জিনিসটা তোমার বন্ধুদের দাও গে!

—উঁ.........এখনও দেখছি রাগ পড়েনি। এই তোমার হাত ধরলাম।

মৃদু হেসে রীণা বলে—কি করছো, ছাড়, ছাড়। কেউ দেখে ফেলবে।

—দেখুক। এই, এই আংটিটা পরিয়ে দিই। ব্যাস। কি সুন্দর মানাচ্ছে তোমার হাতে। যেন সোনায় সোহাগা।

রীণা মনে মনে সত্যিই খুশী হয়ে বলে—এত পয়সা খরচ করার কি দরকার ছিল তোমার?

রফিকের সেকথায় কান ছিল না। তার চোখ দুটো তখন রীণাকে ঘিরে রয়েছে। চোখের যেন পলক পড়ে না। রীণার চোখে খুঁজতে থাকে সে তার আগামী দিনের ছবি। মনে মনে তার কত আশা। ডাক্তার হয়েই রীণাকে বিয়ে করবে। এই রীণা আর রীণা থাকবে না, তখন সে তার রাণী। দুচোখ ভরে তখন সে দেখবে তার রীণাকে। থাকবে না কোন বাধা। কেবল রীণা আর সে।

রফিককে এভাবে অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রীণা বলে—কি দেখছো, অমন করে?

আবেগভরা কণ্ঠে রফিক বলে—তোমায়। আমার রীণাকে! কত সুন্দর তুমি। মনে হচ্ছে, তোমায় সকলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাই অনেক দূরে!

—আমি সুন্দর না ছাই! কেবল মিথ্যে কথা।

রীণার কপট অভিমান রফিকের হৃদয়ে স্পর্শের একটু ছোঁয়ার আগুন জ্বালাল। তাই হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানাল—এই এস না, একটু কাছে।

—যাও, তুমি বড় অসভ্য। কেউ যদি এসে পড়ে?

কেউ আসবে না। উহঃ, তোমার ঠোঁট দুটো কি সুন্দর! যেন ঠিক গোলাপের পাপড়ির মত।

রীণার ঠোঁটে রফিক সেদিন বিলীন হয়েছিল। রীণা কোন বাধা দেয়নি। সেও মনে মনে এটাই কামনা করেছিল। আবেগে দুজনে দুজনকে কতক্ষণ জড়িয়েছিল তা কেউই তখন মেপে দেখেনি।

কথাগুলো গল্পের ছলেই রফিক আমাকে বলেছিল। ভবিষ্যতের স্বপ্নে সে যেন বিভোর!

তারপর দিন কেটেছে। অনেক চেষ্টার পরও রফিক Medical Science-এ Admission পায়নি। একরাশ চিন্তা এসে ঢুকেছে ওর মাথায়—কি করবে ও! এ ব্যাপারে ওর বাবা ওকে বিশেষ সাহায্য করতে পারেনি। Business magnet হলেও যাঁদের ধরলে ওসব কাজ হতে পারে তেমন লোকের সাথে ওনার পরিচয় ছিল না। রফিক তাই হাল ছেড়েই দিয়েছিল। নিজের অদৃষ্টকেই বারে বারে দোষারোপ করেছিল।

পরের দিন সকালে আমরা দুজনে ওর পড়ার ঘরে বসে আছি, ওর বাবা এলেন। বললেন, "দেখ তো বাবা সিরাজ, তুমি একটু বুঝিয়ে। এই সামান্য ব্যাপারে ও যদি এভাবে ভেঙে পড়ে, তাহলে আর সব ছেলেরা কি করবে? আমি বলছি কি, Degree Course-এ ভর্তি হয়ে যাক। তারপর না হয় আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাবে। বাংলাদেশের বাইরে তো অনেকগুলো কলেজ রয়েছে। চেষ্টা করলে সেখানে একটা.........।"

এরকম একটা সুযোগ আমি খুঁজছিলাম। এসে অবধি রফিকের সাথে ভাল করে কথা বলিনি। ওর যা মনের অবস্থা তাতে

বলতে সাহস পাইনি। সুযোগ পেয়েই রফিকের বাবার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম—সুযোগ একটা এসে যাবে। সে কথাই আমি বলছিলাম। মিছেমিছি সময় নষ্ট না করে Degree Courseটা সম্পূর্ণ করলে ক্ষতি কি ?

এতক্ষণ রফিক টেবিলের উপর মাথা গুঁজে বসেছিল। আমার কথায় মাথাটা ও তুললো। চোখ দুটো বেশ লাল। হয়তো একটু আগে কেঁদেছে ও। চুলগুলো উসকো খুসকো। চোখের কোণে ব্যর্থতার ছাপ। বড় মায়া হচ্ছিল ওর এই অবস্থা দেখে। "না বাবা, আমার আর পড়াশুনা করার ইচ্ছা নেই। আমি বরং কোন Business করবো।" কথাগুলো কোনরকমে বলে রফিক আবার টেবিলে মাথা গুঁজলো।

চাচাজী রফিককে বোঝাতে চেষ্টা করেন, বলেন—যেটা হয়ে গেছে সেটা অতীত। তোমাদের মত ছেলে যদি এ নিয়ে আফসোস করে, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ কি হবে ? আমরাও তো কতবার কত কাজে ব্যর্থ হয়েছি ; তা বলে মুসড়ে পড়িনি। কলেজে ভর্তি হয়ে আবার পড়াশুনায় মন দাও। তোমার ভালর জন্যেই বলছি। ভেবে দেখ।

এরপর চাচাজী দাঁড়াননি। ওনার কথাগুলো দৃঢ় এবং স্পষ্ট হলেও মনে মনে উনিও ব্যথা পেয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য ওনার ব্যক্তিত্ব। কোথাও তার দুর্বলতার প্রকাশ নেই। চাচাজীর অনুপস্থিতি কিছুটা মৌনতা বিরাজ করছিল। আলোচনাকে বাড়ানোর জন্য বললাম—কিরে, মুখ তোল। আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই যদি আর না পড়িস চাচাজী দুঃখ পাবেন। তাছাড়া তোর রীণা কি ভাববে বল তো। গ্রাজুয়েট হয়ে কি আর ডাক্তার হওয়া যায় না ?

কোন রকমে মুখটা তুলে রফিক বলে—কিন্তু....।

জোর দিয়ে বললাম—কোন কিন্তু না। কালকেই তোকে কলেজে Admission নিতে হবে।

রফিক সেদিন তার ভবিষ্যৎকে মেনে নিয়েছিল। মেনে নিয়েছিল তার অদৃষ্টকে। রীণার দান এতে অনেক—রীণাই তাকে ভরসা দিয়ে প্রকৃতিস্থ করেছিল—পরে জেনেছিলাম।

—ইস্ ; এ'কদিনে তোমার একি হাল হয়েছে! কত রোগা হয়ে গেছ।

নিজেকে সংযত করে হেসে বলার চেষ্টা করে রফিক। —কই নাতো, এইতো আমি আগের মতোই আছি।

রীণার দৃষ্টি এড়ায় না। ধমক দিয়ে বলে—আমাকে মিথ্যে বলো না; চোখ দুটো ছাড়া সবটাই যেন বদলে গেছে তোমার। কেমন যেন মলিন হয়ে গেছ তুমি। কি হয়েছে, আমাকে খুলে বল।

—না, বলার মত কিছুই হয়নি। বলছিলাম কি—আমি ডাক্তারীতে চান্স পাইনি।

রীণা রফিকের দুঃখ বুঝতে পারে। কিন্তু মুখে বেপরোয়ার ভাব এনে বলে—ডাক্তারীতে চান্স পাওনি তো কি হয়েছে। আরো তো অনেক কিছুই পড়ার আছে। বুঝেছি, ভেবে ভেবে তুমি এমন চেহারা করেছ।

কিছুটা স্বস্তি পায় রফিক। বলে—আমার আবার ভাবনা কি? তুমি আমার পাশে রইলে, এই আমার যথেষ্ট। জান রীণা, degree course-এ আমি ভর্তি হয়ে গেছি। বাবা খুব খুশী হয়েছেন।

—বেশ করেছ। এবার ভাবনা টাবনা ছেড়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো পড়াশুনা কর। আমি বলছি, তুমি অনেক বড় হবে।

আদর করে রফিকের মাথাটা রীণা তার কোলে টেনে নিয়েছিল। একমনে রফিকের এলোমেলো চুলে বিনুনি কাটতে কাটতে বলেছিল "দেখ, একদিন তুমি অনেক বড় ডাক্তার হবে। কত নাম হবে তোমার। সবাই বলবে—তোমার মত ডাক্তার আর এ গ্রামে নেই। তখন ঠিক এমনি আমি তোমার কোলে মাথা রাখবো। তুমি আমায় আদর করবে।"

রীণার কথায় রফিক সেদিন আশার আলো দেখেছিল। মনে মনে আবার শক্তি পেয়েছিল। পেয়েছিল এগিয়ে চলার সাহস। ডাক্তার তাকে হতেই হবে; রীণার স্বার্থে, গ্রামের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আগষ্ট মাসের আধাআধি হয়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টির নামই নেই। চারিদিকে অনাবৃষ্টির ফলে হাহাকার পড়েছে। এ বুঝি মানুষের কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এক পশলা বৃষ্টির জন্যে সবাই যেন চাতক পাখির মত আকাশপানে চেয়ে থাকে। বৃষ্টি হয় না। এমনি এক দিনে আকাশে হঠাৎ মেঘ দেখা গেল। পূবের আকাশ ছেয়ে গেল কালো কালো মেঘে। মেঘের গুরু গুরু ডাক সবাই শুনতে পেল। আনন্দ আর ধরে না। বৃষ্টি নামলো। বিষেজরা পৃথিবীতে নেমে এল অমৃতের ধারা। ভিজছিল সবাই। ভিজছিলাম আমি আর রফিক। অনুভব করছিলাম এই বৃষ্টিকে, দুহাত দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, মুহূর্ত দিয়ে।

—দেখ তো রফিক রিক্সায় ওটা নাজির আসছে না?

—এক ঝলকে রফিক নাজিরকে চিনতে পেরে বলে—আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস। কেমন আছিস নাজির? হঠাৎ বিহার থেকে? কোন ব্যাপার আছে নাকি?

নাজির একটু অবাক হয়ে বলে—সব বলছি। কিন্তু তোরা এভাবে বৃষ্টিতে ভিজছিস যে? কি হয়েছে বল তো?

রফিক হাসতে হাসতে বলে—কি হয়েছে! আরে কি হয়নি বল। একফোঁটা বৃষ্টির জন্যে মানুষ পাগল হয়ে যাচ্ছে। কি ভাগ্য আমাদের। বৃষ্টি এল। তুই এলি। আয়, নেমে আয়, সবাই মিলে একটু ভেজা যাক।

নাজির যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললো—তোরা ভেজ। আমি এখন বড় ক্লান্ত। যা ট্রেন জার্নি। পরে একদিন ভিজবো।

আমরা ওকে আর বিরক্ত করলাম না। শুধু রফিক বললো—কাল সকালে তাহলে বাড়ীতে আয়।

"সকালেই আসবো", বলে নাজির চলে গেল।

—চল সিরাজ, অনেক হয়েছে, এবার বাড়ী যাওয়া যাক। অনেকক্ষণ ভিজলাম।

আমি বললাম—হ্যাঁ, আমায় আবার অনেকটা যেতে হবে। সন্ধ্যেও তো প্রায় হয়ে এল। চলি তাহলে।

—সকালে আসিস। নাজিরের কাছ থেকে বিহারের একটু চুটকি শোনা যাবে।

নাজির চিঠিতে অনেক চুটকিই লিখতো রফিককে। কোনটায় আমিষ, কোনটায় নিরামিষ; আবার কোনটায়—দুয়ের সমন্বয়। চিঠিগুলো রফিক আমায় দেখাতো। দুজনে মিলে বেশ একটু আনন্দও পেতাম। নাজির যে আমায় চিঠি দিত না তা নয়, তবে কখনও সখনো। নাজির আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড। একই সঙ্গে দুজনে Higher Secondary পাশ করেছি। তারপর ও Electrical Training নিতে চলে গেল বিহারে—চার বৎসরের course নিয়ে। পাড়ার ছেলে হিসাবে রফিকের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা অনেক। ভাব, ভাল-

বাসাও কম না। এইতো গত বারে বিহারে যাওয়ার সময় রফিক কতদিক দিয়ে নাজিরকে সাহায্য করলো।

নাজিরের বাবা ছিলেন, মা ছিলেন, আর ছিল দুই ভাই। ওরা দুজনাই নাজিরের থেকে বড়—বিয়ে হয়ে গেছে। বেশ সুখের সংসার। তবে কালের চাকা তো মাঝে মাঝে ঘোরে, তাই অভাব অনটন যে আসে না তা নয়।

বাড়ী গিয়ে রফিক ওর মাকে তলব করে। একটু চেঁচিয়ে বলে—মা, ওমা, একবার এদিকে এস। একটা জরুরী খবর আছে।

রফিকের মা হয়তো কোন কাজে নিযুক্ত ছিল। ব্যস্ত হয়ে এসে বললো—জরুরী খবর! কি বলতো?

খুশীতে রফিক বলে—নাজির এসেছে বিহার থেকে। এইতো একটু আগে আমার সাথে রাস্তায় দেখা হল। মা, তাহলে কালকে দুপুরে ওকে খেতে বলবো।

ছেলের ছেলেমানুষীতে চাচীমা বিরক্ত হয়ে বললো—এই তোর জরুরী খবর! আমি ভাবলাম কি বুঝি। তা নাজিরকে জিজ্ঞেস করেছিস, ও কালকে দুপুরে এখানে থাকবে কিনা। বিহার থেকে এসেই তো নাজির এ আত্মীয় ও আত্মীয় করে বেড়ায়।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে রফিক বললো—জিজ্ঞেস করা হয়নি। বৃষ্টি হচ্ছিল তাই ও তাড়াতাড়ি চলে গেল। কাল সকালে আসবে, তখন বলে দেব। তুমি কিন্তু সকালে খান কয়েক পরটা করে দিও।

—ঠিক আছে। সিরাজকে যেন বলতে ভুল না। আরে, বেলা এখানে দাঁড়িয়ে। দেখতো রফিক কি খবর।

মায়ের মুখে "বেলা" কথাটা শুনে রফিক হঠাৎ চমকে উঠেছিল। বেলার আসার হেতু তার অজানা নয়। কিন্তু এবার বুঝি সত্যি হাতে নাতে ধরা পড়ে যাবে। নিজেকে স্বাভাবিক করে নেওয়ার

চেষ্টা করে রফিক বললো—ও আমার কাছে গল্প শুনতে আসে। এস বেলা, আমার কাছে এস।

চাচীমা একটু অবাক হয়ে বললো—তা এই সন্ধ্যে বেলায়! অতটুকু মেয়ে ভয় করে না?

রফিক এবার সত্যিই ঘাবড়ে যায়। কোন রকমে বলে—ভয়? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভয়। না, না, ও জান মা, একদম ডাকাত মেয়ে। ভয় একেবারেই নেই। বেলা, দাদীমাকে বল তো তোমার একদম ভয় নেই।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বেলা উত্তর দিলো—হ্যাঁ দাদীমা, আমার একদম ভয় নেই।

চাচীমা আর কথা বাড়ায় না, বলে—তাই নাকি? বেশ, বেশ। আচ্ছা তুমি কাকুর কাছে গল্প শোন,—আমি যাই।

এতক্ষণে রফিকের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। বেলাকে কাছে টেনে চুপি চুপি বললো—বেলা, তোমার পিসি পাঠিয়েছে বুঝি?

ফ্রকের ভিতর থেকে বেলা এক টুকরো কাগজ বের করল। এরকম অনেক বারেই করেছে সে। তবে এই সন্ধ্যে বা রাতে নয়। দিনের বেলায়। রীণাই তাকে পাঠায়। রীণার বড়দার মেয়ে বেলা। রীণা খুব ভালবাসে ওকে। বেলা তাই রীণার কথা কখনও অমান্য করে না। প্রয়োজন হলেই সে চলে আসে রফিকের কাছে, রীণার চিঠি নিয়ে। রফিকও কম ভালবাসে না এই বেলাকে। সবাই জানে। তাই সন্দেহ করার কিছু নেই।

কাগজের টুকরোটা রফিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বেলা বলে—হ্যাঁ কাকু। পিসি এটার উত্তর নিয়ে যেতে বলেছে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে রফিক বলে—কিন্তু তুমি একা এলে, ভয় করলো না?

রফিকের কথার উত্তরে বেলা বলে—পিসি নারকেল তলায়

দাঁড়িয়েছিল। কাকু তাড়াতাড়ি লিখে দাও, মা আবার বকাবকি করবে।

পকেটে চিঠিটা রেখে বেলার হাত ধরে রফিক বললো—চল, তোমায় রেখে আসি। তুমি কালকে এসে উত্তর নিয়ে যাবে ; কেমন ? কিছুটা এগিয়ে দিয়ে বলে—এবার যেতে পারবে তো ? তোমার পিসিকে বলবে কাল উত্তর দেব।

—কাকু কালকে কিন্তু লজেন্স কিনে দিতে হবে।

—সে আর বলতে। কাল তোমায় একটা পুতুল কিনে দেব। তুমি এবার যাও।

মনে মনে রফিক ভাবতে থাকে—"কি এমন দরকার যে আজকেই উত্তর চেয়ে পাঠিয়েছে। কি জানি, ওর কখন কি খেয়াল চেপে বসে।"

ঘরে ফিরে এসে পকেট থেকে চিঠিটা বার করে খোলে।—দেখি কি লিখেছে চিঠিতে।

প্রাণেশ্বর,

দুপুরে স্বপ্নে তোমায় দেখলাম। দেখলাম, কে যেন তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল। বৈকাল থেকে তাই বড় খারাপ লাগছে। সত্যি যেন তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি। তোমাকে একটিবার কাছে পাওয়ার জন্য মনটা ছটপট করছে। বেলাকে পাঠালাম। ওর হাতে লিখে দিও কবে দেখা করবে। ভালবাসা নিও।

তোমার রীণা

চিঠিটা পড়ে নিজের মনেই রফিক বলে—পাগলী, যত সব আজে বাজে চিন্তা। তারপর চেঁচিয়ে বলে—মা, ওমা, ভাত বেড়েছ ? অনেক রাত হ'ল।

রান্নাঘর থেকে চাচীমা উত্তর দেয়—হ্যাঁ, হয়েছে। ওঘর থেকে রহিমকে ডেকে নিয়ে এস। ও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাত অনেক হয়েছে। কর্মক্লান্ত পৃথিবী রাতের অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে। কোলাহলময় দিনের কেউই হয়তো জেগে নেই। সবই নিথর, নিঃশব্দ। সবাই ঘুমাচ্ছে শান্তির কোলে। শুধু দূরে বহুদূরে কোন নিশাচর প্রাণীর কর্কশ স্বর শোনা যাচ্ছে। কিন্তু রীণার চোখে ঘুম নেই। নেই শান্তি। ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সে উদ্বিগ্ন। কি করবে সে? কাকে জানাবে সে তার মনের কথা! চিন্তা বহুল, অশান্ত মনে সে বলতে থাকে—না, না, রফিককে সব বলতে হবে। নাজিরকে একদিন ভালবেসেছিলাম; একথা না জানালে—কিন্তু, কেমন করে তা সম্ভব! আমায় যদি ও ভুল বোঝে। বুঝুক, তা বলে এতবড় মিথ্যেকে চেপে রাখতে পারবো না। নাজির তুমি কেন এলে বিহার থেকে! উহঃ! মাথাটা কেমন টনটন করছে। একটু যদি ঘুমাতে পারতাম।

—রীণা, এখনও ঘুমাসনি; কি হয়েছে? শরীর খারাপ নাকি? রীণার মায়ের আগমনে তার চিন্তার ব্যাঘাত ঘটে। উত্তর একটা দিতেই হয়, তাই বলে, "না মা, মাথাটা বোধহয় ধরেছে।"

মেয়ের পাশে বসে মা মাথায় হাত রাখে। বলে,—দেখি দে, একটু টিপে দিই।

চিন্তায় অবসন্ন কারোর স্নেহাস্পর্শ কতই না ভাল লাগে। চোখ বন্ধ করে রীণা সেটুকুই যখন অনুভব করছে তখন মনে হল, মায়ের হাতটা মাথার উপর কেবল রাখাই আছে। মা তার ঘুমিয়েছে।

মায়ের হাতটা কপাল থেকে আস্তে করে নামিয়ে দেয় সে। এবং তারপর পাশ ফিরে শুতেই আবার মনের মাঝে দ্বন্দ্ব—নাজির আর রফিক। হায়রে জীবন!

আসলে নাজির ছিল এবাড়ীর মুকুটমনি। রীণার সাথে তো তার ঘনিষ্ঠতা ছিলই এবং তাকে উপলক্ষ করেই ভবিষ্যতের আশায় নাজিরের প্রতি ছিল তেমনই ভালবাসা। সে ভালবাসা ছিল সবার। এবং নাজিরের এই আগমনে তা এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। নাজীর স্বভাবতই রীণার একটু সান্নিধ্য আশা করে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব; রফিক যে তার চেহারায়, সবলতায় রীণাকে আচ্ছন্ন করেছে; নাজিরকে মনে রাখবে সে সুযোগ তাকে দিলো কোথায়। কি করবে এখন রীণা। কি তার করা কর্তব্য, কিছুই ভেবে পায় না। আর তাই তার চোখে ঘুম নেই। ঘুমই যেন স্বপ্ন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সকালের স্নিগ্ধ সূর্যের আগমনে দূর হয় রাতের মলিনাক্ত কালিমা। সঞ্জিবনী স্রোত বয়ে নিয়ে আসে দিনের কর্মপ্রেরণা। কেউ হয়তো সকালের শুভক্ষণকে স্বাগত জানায়। নিজের গাফিলতিতে কেউ তা পারে না।

"ইস্, এত বেলা হয়ে গেছে—সাড়ে সাতটা। নাঃ, হতচ্ছাড়া ঘুমটা সব programme মাটি করে দিল দেখছি। নাজির বোধ হয় এসে ফিরে গেছে," কথাগুলো বলতে বলতে রফিক ব্রাশ নিয়ে কলতলায় চলে যায়।

মা নাজির এসেছিল নাকি?—সেখান থেকেই ও হাঁক ছাড়ে।

—না, এখনও আসেনি। তুমি এত বেলা করলে যে। এদিকে ঘরে একটাও মিষ্টি নেই। কিছু মিষ্টি আনতে হবে।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে রফিক বলে—ঠিক আছে, তুমি পরটা রেডি কর। মিষ্টি আমি আনাচ্ছি। রহিম, এই রহিম, এখানে একবার শুনে যা।

ঘরের ভেতর থেকে রহিম উত্তর দেয়—কি হয়েছে বড়দা। কোথাও যেতে হবে?

—হ্যাঁ, দু'টাকার রাজভোগ আন দেখি। তাড়াতাড়ি আসবি।

"এখনও আসছে না, প্রায় আটটা বাজতে চললো। ওপরের ঘরে গিয়ে বসি। এক্ষুণি হয়তো এসে পড়বে। আরে! ঐ তো নাজির, রীণাদের বারান্দায় বসে। তবে কি আমায় ফাঁসিয়ে দিলো!" কথাগুলো বলে চুপচাপ ঐদিকে চেয়ে বসে রইল রফিক।

এর মধ্যে আমি ওদের বাড়ী পৌঁছে গেছি। রফিককে এভাবে বসে থাকতে দেখে বললাম—কিরে, তুই এখানে, আমি তোকে নীচে খুঁজছি। নাজির কোথায়? তার তো এখনও আসা উচিত

রীণাদের বাড়ীর দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে অভিমান করে রফিক বললো—আজকের programme-টাই মাটি হয়ে গেল। ওই দেখ বেইমানটা রীণাদের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে।

আমি সত্যিই একটু অবাক হলাম।

—তাইতো, কত আশা করে এলাম সবাই মিলে একটু আনন্দ করবো। আর কিনা—আচ্ছা তাহলে আমি—।

আমার হাতটা ধরে ও বললো কোথায় যাবি, বস। দাঁড়া না, নাজির বেটাকে আমি জব্দ করছি। এমন জব্দ করবো, চিরকাল মনে থাকবে।

রহিম দোকান থেকে এসে পড়লো। রাজভোগের জায়গাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো—নাজিরদা এল না? ডেকে আনবো?

—না ডাকতে হবে না। তুই আমাদের সাথে বস।

নাজিরের অনুপস্থিতিতেই নাস্তায় আমরা খেতে বসি। খেতে-খেতে কথা হয়। রহিম বলে—বড়দা আজকের খেলায় কি হবে? কে কে খেলবে? তুমি খেলবে তো?

মুখের মধ্যে পোরা রাজভোগটা শেষ করে ও বলে—ওসব ঠিক করে রেখেছি। তুই আজ হাফে খেলবি। মাঠে আসবি তো সিরাজ? সন্ধ্যায় আর দেখা হবে না। গফুর চাচা একবার দেখা করতে বলেছেন। কিসব কথা আছে।

বৈকালে নাজির আর আমি দুজনেই খেলা দেখলাম। রফিকের টিমই জিতলো। খেলা শেষে ঘাম মুছতে মুছতে রফিক বললো, "এই যে নাজির, সকালে ঐভাবে আমাদের ঠকালি!"

নিজের দোষকে ঢাকতে মুখে কৃত্রিম হাসি এনে নাজির বলে—খুব রাগ করেছিস তো। তোদের বাড়ীই আসছিলাম। দলুজের সামনে কামালদার সাথে দেখা হয়ে গেল। ব্যাস; বললেন কি সব ভোটের কথা আছে। বাড়ীতে গিয়ে আবার চা-টা খেতে দেরী হয়ে গেল।

—কোন কথা তোর শুনবো না। ঠকানোর মাশুল তোকে দিতেই হবে। কালকে তিনজনে সিনেমায় যাব। সব খরচ তোমার, কি বলিস সিরাজ?

আমার কিছু বলার আগেই নাজির বলে—না ভাই, সবটা পারবো না। আমি অর্ধেক খরচ দেব। বাকীটা তোরা দুজনে দিস।

রফিক এতেই খুশী হয়ে বলে—ঠিক আছে, আমি রাজি। কালকে আবার যেন ভুলে বসো না। চলিরে সিরাজ; গফুর চাচা হয়তো আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

কোন কথার উত্তর আমি দিইনি তখন। ভাবছিলাম, "এইকি ওর জব্দ করা হল। যে ভাবে বললো—না, ওর সঙ্গে আর পারা যাবে না। কখন যে কি করে বসে।"

সত্যি কথা বলতে কি রফিকের স্বভাবটাই ছিল এমনই বিচিত্র। ঠিক জোয়ার ভাটার মত। কখনও উত্তাল তরঙ্গের মত মানে-

অভিমানে ফেটে পড়েছে। আবার কখনো সমুদ্রের শান্ত জলরাশির মত ছড়িয়ে দিয়েছে নিজেকে সবার মাঝে। মাঝে মাঝে ওর এহেন ব্যবহারে বিরক্তবোধ করলেও, উত্তেজনা বা রাগকে উপশম করার ওর এই প্রবৃত্তিকে মনে মনে সমর্থন করতাম। তাই তো আজকের এই প্রস্তাবে সম্মতি না জানিয়েও সিনেমায় আমায় যেতেই হবে।

পার্টি পলিটিক্সের ব্যাপারে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া মানে, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা। একথা রফিক বুঝতো। বুঝতো বলেই নিজেকে সরিয়ে রাখতো অনেক দূরে, ঐ ছোঁয়াচে রোগের কাছ থেকে। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে পার্টির কাজ ওকে করতে হয়েছে। করতে হয়েছে গফুর সাহেবের সম্মানে, আদেশে। আদেশ এড়ানো যদিও দুরূহ কাজ নয়, তবুও সে চেষ্টা রফিক করেনি কোনদিন—পাছে চাচাজী দুঃখ পান।

এলোমেলো চিন্তা করতে করতে রফিক এগিয়ে চলে—চাচাজীর বাড়ীর দিকে। চাচাজী হয়তো কোন গুরু দায়িত্ব আজ তুলে দেবেন তার কাঁধে। যদিও আজ পর্যন্ত পার্টির কোন গুরু দায়িত্বের কাজ রফিকের ভাগ্যে পড়েনি। তবুও একটা আশংকা, একটা অনিশ্চয়তা নিয়ে রফিক হাজির হয় গফুর সাহেবের বাড়ী।

নির্বাচনী তালিকায় গফুর সাহেবের দু চোখ নিবদ্ধ ছিল। রফিকের উপস্থিতিতে মাথাটা তুলে তিনি বললেন, "বস বাবা। জান রফিক, অঞ্চল কংগ্রেস কমিটি থেকে এই ভোটার তালিকাটা পাঠানো হয়েছে। এতে আমাদের তিন নম্বর বুথের সমস্ত ভোটার-দের নাম আছে। তুমি একবার দেখ তো, কারও নাম বাদ পড়লো কিনা ?"

বিরাট একটা তালিকা রফিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে গফুর

সাহেব আবার বললেন—আমি দুবার দেখেছি। ভুল আছে বলে তো মনে হয় না। তবুও বাবা, এ চোখকে আর বিশ্বাস নেই।

ইচ্ছা না থাকলেও উপায় নেই। ধৈর্য ধরে এতখানি লিষ্টটা দেখা সত্যিই বিরক্তিকর। কিন্তু রফিক নিরূপায়। একটানা মিনিট পনের মাথাগুঁজে দেখার পর রফিক বলে, "না চাচাজী, সব ঠিকই আছে।"

ঠিক আছে, একথাটা জেনে গফুর সাহেব মনে মনে খুশী হলেন। লিষ্টটা রফিকের কাছ থেকে নিয়ে বললেন, "ভোটের তো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। এদিকে কয়েকটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। ভোটারদের স্লিপগুলো এখনও দেওয়া হয়নি। অফিস থেকে কতকগুলো পোষ্টার দিয়ে গেছে; সেগুলো মারতে হবে। ডাক্তারের ছেলে সামিমকে বলেছি, ও বুথ তৈরী করার ভার নিয়েছে। তা তোমায় বাবা, দুটো কাজ করতে হবে।

আবার হয়তো একঘেয়েমির মধ্যে পড়তে হবে। বিনীত স্বরে রফিক বলে—কি করতে হবে বলুন।

সস্নেহে গফুর সাহেব বললেন—ভোটার স্লিপগুলো আমি ঠিক করে রেখেছি। এগুলো ভোটারদের পৌঁছে দেবে; আর পোষ্টার-গুলো কাল সকালে মেরে দেবে। আমার বড় ছেলে মাজবুল তোমার সঙ্গে থাকবে। হ্যাঁ বাবা, ভোটারদের একটু বুঝিয়ে দেবে, যাতে ছাপটা ঠিকমত জায়গায় পড়ে। নচেৎ এত কষ্ট বিফলে যাবে।

এসব কাজ রফিককে প্রতি election-এ করতে হয়। তাই রফিক বললো—ওসব চিন্তা করবেন না চাচাজী, ঠিক বুঝিয়ে দেব আমি। তবে কি জানেন, ব্যালোট পেপার মোড়বার সময় মেয়েরা যত গণ্ডগোল করে বসে। আপনার কাছে নকল ব্যালোট পেপার আছে? বোঝানোর সুবিধা হত।

রফিকের কথায় গফুর সাহেব উঠে পড়লেন। দেরাজ খুলে

কয়েকটা নকল ব্যালোট পেপার রফিককে দিয়ে বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ বাবা। এগুলোর কথা আমার মনেই ছিল না। একা মানুষ সবদিক আর খেয়াল থাকে?"

—আমি তাহলে আসি চাচাজী। রাত অনেক হল। মা হয়তো রান্নাঘরেই বসে আছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এস। মাজবুলকে কাল সকালে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।

সকাল বেলায় একরাশ চিন্তা রফিকের মাথার মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। চা-খাবার খেয়ে নিজেকে নিজেই বলে—পোষ্টারগুলো আজ লাগাবো বললাম। ওদিকে রীণার সাথে দেখা করতে হবে। সিনেমা দেখার কথাও আজ। এখন কোনটা রেখে কোনটা করি। দেখি, আগে পোষ্টারগুলো মারার ব্যবস্থা করি।

পড়ার ঘর থেকে পোষ্টারগুলো বার করে রফিক চেঁচিয়ে বলে—মা, ওমা, একটু লেই করে দাও তো।

—মাজবুলটা এখনও এল না। যতসব কুড়ের দল। রফিক পায়-চারি করে।

"রফিক, এই রফিক, বাড়ী আছিস"—চেঁচাতে চেঁচাতে মাজবুল বাড়ীতে প্রবেশ করলো।

খানিক বিরক্ত হয়েই রফিক বলে—একে তো দেরীতে এলি, তাতে আবার ষাঁড়ের মত চেঁচাবার কি আছে। তোর যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকতো।

কাচুমুচু হয়ে মাজবুল বললো—ঘুম থেকে উঠতেই দেরী হয়ে গেছে। বেশী বেলা তো হয়নি, এই তো আটটা বাজল।

দাঁতে দাঁতে পিসে রফিক বললো—হাঁদা, কখন সকাল হয় তা জানিস? যাক সে কথা। এখন মই কোথায় পাওয়া যাবে বল?

পোষ্টারগুলো দেওয়'লের ওপরে না মারলে বাচ্চারা সব নষ্ট করে ফেলবে।

মাজবুলের ঠোঁটের গোড়ায় কথাটা যেন আটকে রয়েছিল; বললো—কেন, রীণাদের তো রয়েছে। তুই চাইলেই দেবে।

"তুই তাহলে রান্নাঘরে গিয়ে দেখ, লেইটা হল কিনা। আমি ঘুরে আসি", কথাগুলো বলে রফিক রীণাদের বাড়ীর দিকে চললো। যাওয়ার পথে রফিক ঠিক করে নিয়েছে, আজ কখন সে তার রীণার সাথে দেখা করবে। এদিকে রফিকের উপস্থিতি টের পেয়েই রীণা নীচে নেমে এসেছিল। ভেবেছিল, রফিক হয়তো এসেছে তারই কাছে। তাকে সমস্ত কথা খুলে বলবে সে আজ।

রীণার মাকে উদ্দেশ্য করে রফিক বললো—চাচীমা, তোমাদের মইটা একবার দিতে হবে।

রীণাকে দেখতে পেয়ে ওর মা বললো—রীণা, গোয়ালের পাশে মইটা আছে রফিককে দেখিয়ে দে তো।

এরকম একটা সুযোগ রীণা খুঁজছিল। বললে—মইটা গোয়ালের ভেতরে আছে মা। আমি তুলে রেখেছি। এস রফিকদা। একা বের করতে অসুবিধা হবে।

রফিক গুটি গুটি রীণাকে অনুসরণ করে গোয়ালের মধ্যে ঢুকলো।

বেশ গম্ভীর হয়ে রীণা বললো—তুমি তাহলে আমার সাথে দেখা করতে আসনি; নিজের কাজেই এসেছ?

কিছুটা ইতস্ততঃ করে রফিক বললো—না, মানে—হ্যাঁ; কতকগুলো পোষ্টার মারতে হবে। তাই মই-এর দরকার। সন্ধ্যা বেলায় আমি আসছি। চিলেঘরে তুমি থেক কিন্তু। এখন তাড়াতাড়ি বের কর দেখি, কেউ আবার সন্দেহ করবে।

ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি এনে রীণা বলে—হুঁ, এদিকে তো তোমার বেশ ভয়। চিলেছাদে অসভ্যতা করতে ভয় করে না?

ব্যস্ত হয়ে রফিক বলে—এর উত্তর সন্ধ্যেয় পাবে। এখন চলি।

হন্তদন্ত হয়ে রফিক মই নিয়ে চলে এসেছিল। মাজবুলকে নিয়ে পোষ্টার মারার কাজ আরম্ভ করে দিল। ওর ইচ্ছা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে দুপুরের শো-তে সিনেমা যাবে। তারপর সন্ধ্যেয় রীণার সঙ্গে দেখা করবে।

নিজের প্রয়োজনে নাজির রাস্তায় যাচ্ছিল। রফিককে পোষ্টার মারতে দেখে পিছন থেকে কাপড় টেনে বললো—কিরে রফিক, পার্টির হয়ে খুব যে খাটছিস। ব্যাপার কি, এত সকাল বেলা থেকেই ?

—সিনেমায় যেতে হবে যে, মনে নেই সিনেমার কথা ? দুপুরের শো-তে যাব। যাওয়ার পথে সিরাজকে ধরে নেব।

দু-একবার মাথা চুলকে নাজির বললো—ও হ্যাঁ, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। দুপুরের শো-তে হয়তো সম্ভব হবে না। একবার সাকিলাদের বাড়ী যেতে হবে। খবর পাঠিয়েছে, বিশেষ প্রয়োজন।

—তাহলে ?

সহজ ভাবেই নাজির বলে—সন্ধ্যের শো-তে যাব। দুপুরের শো-তে ঠিক জমে না। আচ্ছা তুই তৈরী থাকিস। আমার আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

রফিক ভাবতে থাকে, "এখন কি করা যায়। একদিকে রীণা, অন্যদিকে নাজির। নাজিরকে হয়তো রাজী করানো যেত, কিন্তু ওর তো আবার বিশেষ প্রয়োজন। না, রীণা সত্যিই এবার ক্ষেপে যাবে। কয়রে মাজবুল, ভাল করে ধর। মইটা যে হড়কে যাবে।"

—এই তো। আর কটা আছে রে ? দুপুর হয়ে গেল যে।

—ব্যাস, শেষ করে ফেলেছি। আর মাত্র দুখানা বাকি।

সেদিন আর রীণার সঙ্গে রফিকের দেখা করা হল না। তিন বন্ধুতে সিনেমা দেখতে গেলাম বৈকালে। সন্ধ্যেটা বেশ আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কাটলো।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাশের বাড়ীর মেয়ে সাগর। ওর বাবার অবস্থা সচ্ছল না। কোন রকমে দর্জির কাজ করে সংসার চালায়। সম্পর্কে রফিক ওর চাচাতো ভাই। কিন্তু রফিকদের বাড়ীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক অনেক বেশী। ওর সমস্ত দিনটা কেটে যায় রফিকদের বাড়ীতে। রফিকের মাকে সাংসারিক কাজে সাহায্য করে সাগর। প্রতিদানে ওরা যা পায় তা অনেকখানি। সাগর রফিকের থেকে বছর তিনেকের ছোট। দেখতে খুব সুন্দরী না হলেও দেহের গড়নটা বেশ আঁটসাঁট। ছোটবেলা থেকে রফিক আর সাগর এক সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। কিশোর থেকে এই যৌবনে এসে অবধি সাগর রফিকের অনেক কাজেই এসেছে। বিশেষ করে খেলাধূলায় চোট হলে সাগরই ওর শুশ্রূষা করে। ওরা দুজনে ভাইবোনের মত। রফিকও তাই ভাবে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে সাগর রফিককে ওর হৃদয়ের এক কোণে বেঁধে ফেলেছে। একথা রফিক কোনদিনই টের পায়নি। টের পায়নি সাগরের সতর্কতায়।

নিজের ঘরে বসে জানালা দিয়ে দূরের ঐ টুকরো টুকরো মেঘের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল রফিক, হঠাৎ সাগর তার কল্পনাকে ভেঙ্গে দেয়, বলে—রফিকদা, তুমি তো বাড়ী বাড়ী খুব ঘুরছো, ভোটের জন্যে। কিন্তু আমার আব্বার কাছে একবার গিয়েছিলে ?

—কেন, তোর আব্বার কাছে যেতে হবে কেন। উনি তো আমাদের পুরোন লোক। হ্যাঁ, তোর মাকে একবার ভাল করে বলে আসবো।

একটু এগিয়ে এসে সাগর বলে—না রফিকদা—আব্বা বোধহয় এবারে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেবে। সেদিন রীণার দাদা কামাল সাহেব আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। কিসব আব্বাকে বোঝালেন। আব্বা তো কথা দিয়ে দিলেন যে, উনি যুক্তফ্রন্টকেই ভোট দেবেন।

—তা আমি কি করতে পারি বল। তোর আব্বা তো আর ছেলেমানুষ নন। উনি সব বোঝেন; যেটা ভাল বুঝবেন সেটাই করবেন। তোকে এবছর ভোটার করা হয়েছে। কাকে ভোট দিবি ?

—তোমাকে।

রফিক হেসে বলে—আমাকে কিরে ? আমি কি প্রার্থী নাকি ?

ঘাড়টা একটু দুলিয়ে সাগর বলে—ওই হল, তুমি মানে তোমার দলকে। পরশু তো ভোটের দিন, না ?

এদের কথার মাঝে রফিকের মার ডাক পড়ে।

—সাগর, মা ডাকছে, তুই যা। হ্যাঁ, তুই কিন্তু ভোটের দিনে আমাকে একটু সাহায্য করবি। ঠিক সময়ে মেয়েদের বের করা হল তোর কাজ।

রফিকের কথায় সাগর খুব খুশী হয়ে বললো—সে আর ব'লতে, দেখবে কেমন কাজ করি। আচ্ছা রফিকদা, রীণাদের বাড়ীর

কাউকে হাত করতে পারনি? ওদের সঙ্গে তোমার তো খুব ভাব।

—দূর বোকা, আমি না বলে ওরা যদি আমায় বলে, তাহলেই কি আমি যুক্তফ্রণ্টকে ভোট দেব? যা, যা, মা আবার রাগ করবে।

সাগর চলে গেলে রফিক ভাবতে থাকে রীণার কথা। দুদিন হয়ে গেল অথচ রীণার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি সে। শেষে ঠিক করলো এখনই সে যাবে রীণাদের বাড়ী।

রফিক বেরিয়ে পড়ে। আমি তখন রফিকদের বাড়ীই আসছিলাম। সদর দরজায় ওর সাথে দেখা হয়ে গেল। বললাম, "কোথায় যাচ্ছিস? আমি যে তোর কাছেই এলাম।"

—আমি একটু রীণাদের বাড়ী যাচ্ছি। ক'দিন হল যাওয়া হয়নি। ওরা হয়তো ভাবছে, ভোট ভোট করেই আমি ব্যস্ত; ওদের কথা ভুলে গেছি।

মনে মনে আমি হাসছিলাম। আশ্চর্য, রফিক যা ভাবে তা যদি সত্য হত! রফিকের মার সাথে দেখা করে আমি ওর ঘরেই বসলাম। Plain truth-টা নিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছি, এমন সময় সাগর চা নিয়ে এল। এ বাড়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘ হওয়ায়, সাগর তেমন লজ্জা করতো না। চায়ের কাপটা বাড়ীয়ে দিয়ে, স্পষ্ট গলায় সাগর বললো—সিরাজদা, মা চা পাঠালেন।

ওর হাত থেকে কাপটা নিয়ে টি পয়ের উপর রেখে আবার ম্যাগাজিনে মন দিয়েছি; দেখলাম, সাগর দাঁড়িয়ে আছে। কিছু যেন বলতে চায়।

"কি তুমি কিছু বলবে?" প্রশ্ন করলাম।

—না—মানে, রফিকদা কোথায় গেল? তোমার সাথে দেখা হয়নি?

খুব সহজ ভাবে বললাম—রফিক রীণাদের বাড়ী গেছে। এখুনি হয়তো এসে পড়বে।

—আচ্ছা সিরাজদা তুমি তো ওর বন্ধু, ওর সব কথাই তুমি জান ; রীণারা সত্যিই কি ওকে খুব ভালবাসে ?

সাগরের চোখে কৌতূহল। যেন কিছু জানতে চায় আমার কাছে। বললাম—এ ব্যাপারে আমি ঠিক বলতে পারবো না। রফিক তো বলে, ওরা খুব ভাল। তা তুমি এসব জেনে কি করবে ?

হঠাৎ এরকম প্রশ্নে ভয় পেয়ে সাগর বলে—এমনি, রফিকদা ওদের বাড়ী প্রায় যায় তো।

তারপর এক মুহূর্ত দাঁড়ায়নি সাগর। আমি তখন একটা রহস্য পেয়ে বসেছি। প্রেম-ট্রেমের ব্যাপারে আমার হাত স্বভাবতই পাকা। সাগর সহজেই আমার কাছে ধরা পড়ে গেল। বেচারী সত্যি রফিককে ভালবেসে ফেলেছে। এর আগে সন্দেহ যে আমার হয়নি তা নয়, তবে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। এখন বুঝলাম, কেন সাগর রফিককে অত ভালবাসে; নিজে হাতে সেবা শুশ্রূষা করে। প্রথমে ভেবেছিলাম, রফিককে ব্যাপারটা জানাবো। কিন্তু ভেবে দেখলাম, না জানানোই ভাল। রফিক মেনে নিতে পারবে না।

এতক্ষণে রীণাদের বাড়ী থেকে রফিক ফিরে এল। আমাকে বসে থাকতে দেখে বললো—ভালই হল তুই আছিস। ভাবছিলাম এখনি তোর বাড়ী যাব।

হেসে বললাম—কেন, রীণার সাথে গোলমাল হয়েছে নাকি ?

—না, গোলমাল ঠিক না। তোকে তখন মিথ্যে বলেছিলাম। গিয়েছিলাম আমি রীণারই সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু রীণা যেন কেমন এড়িয়ে গেল। ইচ্ছে করলে আমার সাথে ও অনেক কথাই বলতে পারিতো। কিন্তু—।

আমি বললাম—আবার কিন্তু কেন ? হয় অভিমান হয়েছে ;

নয়তো সুযোগ পায়নি। তোকে নিয়ে না—যদি মেয়ে হতিস, বুঝতিস, মেয়েদের কত অসুবিধা। চল ঘুরে আসি।

ভোটের দিন এসে গেল। সকাল থেকেই সাজ সাজ রব। এদিনটা আমাদের গ্রামে একটা উৎসবের মতো। রাস্তার দুপাশেই দুপক্ষের বুথ হয়েছে। পোষ্টারে পোষ্টারে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে সেগুলো। চঞ্চল কর্মীরা কখনো কাজের মাঝে, কখনো চায়ের মাঝে। তাদের আনন্দের সীমা নেই। সকালে রফিক মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত রইলো। সাগর ওকে একান্ত ভাবে সাহায্য করছিল। বেলা ১১টার পর রফিক আমি ওর মটর সাইকেল নিয়ে বের হলাম। প্রতিটা বুথ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। কোথাও সুষ্ঠভাবে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে; কোথাও বা চেঁচামেচি, গণ্ডগোল। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে পুলিস আছে, কিন্তু লোকের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দুপুর গড়িয়ে এল। বাড়ী ফেরার পথে দেখি, রীণা ওর বৌদির সঙ্গে রিক্সায় ভোট দিতে যাচ্ছে।

রীণাকে রিক্সায় দেখে রফিক চমকে উঠে বললো—কি ব্যাপার! রীণাকে আমি ভোট দিতে যেতে মানা করেছিলাম, অথচ, দিব্বি সেজেগুজে ভোট দিতে যাচ্ছে! আশ্চর্য! আমার কথা কখনো অমান্য করেনি ও!

ওর কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বললাম—ভোটার হয়েছে ভোট দেবে না। দেশের নাগরিক হিসেবে ওর তো একটা অধিকার আছে। তাছাড়া খামকা নিজেকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন যুক্তি নেই। একটা ভোটের উপর জয় পরাজয়ও নির্ভর করতে পারে।

—না, আমি বলছি, আমার মানা সত্ত্বেও—।

—তোর যত ছেলেমানুষী আবদার। চল, আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবি। বেলা অনেক হলো।

নাওয়া খাওয়া সেরে নিজের ঘরে শুয়ে ভাবতে থাকে রফিক—মানা করা সত্ত্বেও রীণা শেষে ভোট দিতে গেল। কিন্তু রীণার এ পরিবর্তন কেন? কে, সাগর, কি দরকার?

সকাল থেকে সাগর নিজেকে সাজিয়ে রেখেছে। সে দারুণ আনন্দিত। সারা সকাল সে রফিকের সাথে থাকতে পেরেছে, এটা কম বড় আনন্দ নয়। আসলে সে যাকে ভালবাসে সে তারই সঙ্গ পছন্দ করে। কিন্তু এগারোটার পরে রফিক হঠাৎ চলে যাওয়াতে বেচারীর মনে লেগেছিল। রফিক ফিরে এলে সে তার শূন্য মনকে পুরণ করার সুযোগ খুঁজছিল।

—রফিকদা তুমি যে বলেছিলে রীণা ভোট দিতে যাবে না। ওকে তো যেতে দেখলাম।

আশ্চর্য হয়ে রফিক বলে—আমি কবে বললাম যে, রীণা ভোট দিতে যাবে না!

—তুমি সেদিন বেলাকে বলছিলে, আমি শুনেছি।

আড়ি পেতে শুনেছিলি? ছিঃ, ছিঃ, তুই আড়ি পাততেও শিখেছিস্? কিন্তু যাক, ভবিষ্যতে আর যেন না হয়। জানতে পারলে শাস্তি পেতে হবে বুঝলি।

রফিকের শাসনে সাগরের দুঃখ হয়। অভিমানে বলে—তুমি আমায় খামকা বকছো রফিকদা। চাচীমার দুধ দিতে এসে তোমার কথাটা শুনতে পেয়েছিলাম। তাই বললাম।

—আচ্ছা, তুই এখন যা। রীণার সম্পর্কে কখনও কোন কথা আর যেন না শুনি।

সাগর সেদিন বুকভরা ব্যথা নিয়ে চলে এসেছিল। এ ব্যথা সে কাউকেই দেখাতে পারেনি। সেদিন সে জেনেছিল, রফিক একমাত্র

রীণাকেই ভালবাসে। রফিকের কাছে তার কোন অধিকার, কোন মূল্যই নেই। অজস্র গুমরে ওঠা অশ্রুজলে চোখ দুটো তার ভরে উঠেছিল। অনেক দিনের স্বপ্নে দেখা তাসের ঘর ভেঙ্গে গিয়েছিল। অন্তরের ব্যথা তার অন্তরকে করেছিল পাথর। এটাই স্বাভাবিক।

তারপর সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে। রফিক রীণার বন্ধন সে ছিন্ন করবেই।

বৈকালে রফিকদের বাড়ী এলাম। বেলা চারটে হবে। রফিক ঘুমাচ্ছিল; ওকে ডেকে দিয়ে চাচীমার ঘরে গেলাম। ক'দিন হল চাচীমার জ্বর হয়েছে।

"কে, সিরাজ? কখন এলে? রফিকের সঙ্গে দেখা হয়েছে?" কথাগুলো একদমে বলে চাচীমা একটু হাঁফিয়ে উঠলো।

একটু জিরিয়ে আবার বললো—তা বাবা, সিরাজ, তোমাদের ভোট কেমন হল। এবার তোমাদের পার্টি জিতবে তো?

—তা কি আর বলা যায় চাচীমা? তবে কংগ্রেসের চান্স বেশী।

কিছুক্ষণ পর আমাদের এই ঘরোয়া আলোচনার মাঝে চাচীমা রফিকের বিয়ের কথা পাড়লো। বললে—তোমার তো এ বছরটাই ফাইনাল ইয়ার। রফিকও এ বছর ফাইনাল দেবে। তাই বলছি, দু'বন্ধুতে এবার বিয়েটা করে ফেল। শরীরের যা অবস্থা বেশীদিন আর না।

—কি যে বল চাচীমা! তা বেশ তো; রফিকের বিয়ে দিয়ে দাও না। চাকরী না হওয়া পর্যন্ত আমার বিয়ে সম্ভব না।

চাচীমা একটু নড়ে বসতে চেষ্টা করে। বলে—রফিক তোমাকে বিয়ের কথা কিছু বলে?

রফিক সম্পর্কে সব জেনেও চাচীমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বললাম—মাঝে, মাঝে। আমাদের আলোচনার মাঝে রফিক এসে পড়ায় আলোচনা অন্য পথে ঘোরে। কারণ চাচীমা কোনদিনই নিজের ছেলের বিয়ের কথা ছেলের সম্মুখে তুলতো না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নাজির যদিও রফিকের বন্ধু, কিন্তু ভোটের সময় সে যেন অন্য মানুষ। এ কথা রফিক আমায় অনেকবারেই বলেছে। সত্যি কথা বলতে কি, কামাল সাহেবের অধীনে যে সব বামপন্থী কর্মী কাজ করতো তারা তাঁর বশীকরণ জালে জড়িয়ে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলতো। ভোটকে তারা কখনও সহজে নিতে পারেনি।

কামাল সাহেব হয়তো রাস্তার দিকেই বেরিয়েছিলেন। নাজিরকে দেখে বললেন—কি নাজির, সব ঠিকমত হল তো?

নাজির খুশী মনেই বললো—সে আর বলতে। তা, অন্যান্য বুথে vote custing কেমন হল কামালদা? আমি আবার সবগুলো ঘুরে আসিনি।

বিজ্ঞের হাসি হেসে কামাল সাহেব বললেন—তা বেশ ভালই হয়েছে। এবারে আমরা নিশ্চিত সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাব। তা যা না, তোর ভাবীর কাছে একটু চা-টা খেয়ে আয়। ক'দিন ভোটের জন্য যা কষ্ট হল। বাড়ীতে তো আসতেই পারিসনি।

এরকম আহ্বান কখন কাউকে তিনি করেছেন কিনা সন্দেহ আছে। কথাগুলো উনি নাজিরকে এমন ভাবে বললেন যেন, নাজিরকে কতই না ভালবাসেন।

কামাল সাহেবের কথায় খুশীতে গদ গদ হয়ে নাজির তাদের বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়। বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই রীণার সাথে তার দেখা। মুহূর্তের জন্য উভয়ের দর্শন ঘটলো। নাজিরের সতর্ক ইঙ্গিতে রীণা চলে যায় চিলে ঘরে। তারপর নাজির যায় সেখানে। নাজিরের গতিবিধি এ বাড়ীর কেহই নজর রাখে না। কারণ তারা জানে নাজীর রীণার ভবিষ্যতের সাথী। এ বিষয়ে সুযোগের সৎ ব্যবহারে নাজির পটু। নিজের কষ্টিপাথরে রীণাকে সে যাচাই করে নেয়।

—আচ্ছা রীণা, আমি তো চার বছর বিহারে ছিলাম, একবারও আমার কথা মনে পড়েছিল?

—তুমি চার বছরের কথা বলছো নাজিরদা ; চারদিন তুমি আমাদের বাড়ি আসনি, তাতেই মনটা কেমন করছিল। রীণা তাকে ভালবাসে জানলেও, এতটা বাসে নাজির তা ভাবতেও পারেনি।

—এত মায়া হয়ে গেছে! জান, চাকরীটা একরকম ঠিকই হয়ে গেল। আসছে মাসে জয়েন করতে হবে। ভাবছি, বাবাকে দিয়ে বিয়ের কথাটা পাড়বো এবার।

রীণা অবাক হয়ে বলে—কার বিয়ে?

—কেন, তোমার—আমার।

—এত তাড়া কিসের নাজিরদা। আর এক বছর যাক না। কেমন সব স্বাধীনতা রয়েছে—বিয়ের পর তো যত গণ্ডগোল।

রীণার মন্তব্যে তর্ক না করে নাজির বলে—তা, তা—আমার তাড়া নেই। তুমি যা বলবে।

প্রেমালাপ বুঝি আরও চলতো। কিন্তু রীণার মা এসে পড়ায় ওরা কথা ঘুরিয়ে দেয়। রীণার মা একথা বুঝতো। অনেক সময় ইচ্ছা করে চলে যেত। কিন্তু কখনও সে ওদের আলোচনাকে দীর্ঘ হতে দেয়নি। পাছে কেউ কটু কথা বলে।

নাজির চলে গেলে অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক বোঝা পড়ার পর রীণা তার মন স্থির করে নিয়েছে। নাজিরকে সে তার জীবন সাথী করবে। নাজির সুন্দর, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাছাড়া তাদের বাড়ীর সকলেরই পছন্দ নাজিরকে। নাজিরের কথাতেই তাই সে সেদিন ভোট দিতে গিয়েছিল।

ভোটের পর রীতিমত কলেজ আরম্ভ হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ছুটি হয়ে গেছে আজ। রফিকদের বাড়ী যাব বলে বের হয়েছি ; রাস্তায় নাজিরের সঙ্গে দেখা। ওর চাকরীর ব্যাপারে অনেক কথা হল। খুব বেশি না হলেও মোটামুটি ভাল মাইনে। আমার হাতটা ধরে নাজির বললো—চল সিরাজ, একটু চা খেয়ে আসি হোটেলে।

—বাড়ী থেকে এখুনি খেয়ে এলাম। আচ্ছা চল।

চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়ে নানা গল্প করলাম আমরা। রফিকের কথা উঠলো। কথায় কথায় বললাম—এবার কামাল সাহেবের কাছ থেকে বকশিস একটা তুই পাবি! যা পরিশ্রম করলি ভোটের জন্য।

—খুব যে, এঁ্যা। তা বকশিস একটা দেবেন হয়তো। তবে সেটা পরে।

"পরে কি রকম! পেলে কিন্তু জানাবি। আমার বড় হিংসা হচ্ছে," বলে হাসলাম।

—ঠাট্টা করছিস, তা কর। তবে কথাটা সত্যি। হ্যাঁ, তুই রফিকের কাছে যাবি তো?

—তুই ও চল না। একসঙ্গে বেশ একটু গল্প করা যাবে।

—না, তুই যা। আমি পরে একদিন যাব। বাজারে একটু দরকার আছে।

রফিকের বাড়ী এসে দেখি ও তখন কলেজ থেকে ফেরেনি। এ'কদিনে চাচীমা সুস্থ হয়েছে। আমাকে দেখে চাচীমা সাগরকে পাঠিয়ে দিল; রফিকের ঘরের তালা খোলার জন্যে। আমি সাগরকে জিজ্ঞেস করলাম, "রফিক কখন কলেজ থেকে ফিরবে?"

—আধ ঘণ্টার মধ্যে। জান সিরাজদা, রফিকদা কাশ্মীরে যাচ্ছে।

—সে কিরে! সামনে তার পরীক্ষা! এরই মধ্যে—।

—না, পরীক্ষার পরেই যাবে; চাচীমাকে সেদিন বলছিল। তুমি যাবে নাকি সঙ্গে?

—না, না, আমার বাপের অত পয়সা নেই। প্রথমে চাকরী করি। পয়সা রোজগার করি, তারপর কাশ্মীর।

—তুমি চা খাবে তো?

—না, এইতো নাজিরের সঙ্গে রাস্তায় খেলাম।

—নাজিরদা অনেকদিন হল এখানে আসেনি। রীণাদের বাড়ী প্রায়ই যায়। আচ্ছা সিরাজদা, তোমাকে তো কোনদিন রীণাদের বাড়ী যেতে দেখলাম না। হঠাৎ রফিকের গলার আওয়াজে সাগর চঞ্চল হয়ে বলে—এই রে, রফিকদা এসে গেছে। আমি যাই।

আমার উত্তর না নিয়েই সাগর ঘড় ছেড়ে চলে যায়। আমি সব বুঝতে পারি। কিন্তু করার কিছুই নাই। মাঝে মাঝে দুঃখ হয়. বেচারীর জন্যে।

আমাকে দেখে রফিক বেশ খুশীই হল। বইখাতা টেবিলে রেখে বললো—কতক্ষণ এসেছিস সিরাজ? আজকে বুজি তাড়াতাড়ি কলেজ হয়ে গেল?

—হ্যাঁ, এই কিছুক্ষণ হল। পরীক্ষার প্রোগ্রাম কিছু পেলি?

—আসছে মাসের দু' তারিখে হবে শুনলাম। তা তোর খবর কি?

—আমার তো এমাসের শেষের দিকে হওয়ার কথা। কাল বোধহয় প্রোগ্রাম পাব। একটু থেমে আবার বললাম, তুই নাকি কাশ্মীরে যাচ্ছিস?

খানিকটা সময় নিয়ে রফিক বললো—দেখি, ভাবছিতো একবার ঘুরে আসবো। কলেজের কয়েকটা বন্ধু যা করে ধরেছে। তাতে বোধহয় যেতেই হবে। কিন্তু রীণাকে ছেড়ে অতদিন সেখানে থাকবো কি করে ভাবছি।

মুচকি হেসে বললাম—রীণাকে তো সাথে নিলেই পারিস। একবার কামাল সাহেবকে গিয়ে বল না।

—ওরে বাপরে! তাহলে—! যাক সে কথা, তোর পড়াশুনা কেমন হচ্ছে বল। আমি তো ভাবছি রীণার সাথে একবার দেখা করে, তারপর পড়াশুনা আরম্ভ করবো।

রীণার সম্পর্কে এরকম রঙ্গিন আলোচনায় আমার ঠাট্টা করতে ইচ্ছা করতো। আমি বলতাম—তা আর করবে না। যা, দেখ, লায়লী হয়তো বিরহে কাল যাপন করছে। অনেকদিন তো রীণার সাথে তোর দেখা হয়নি।

—হুঁ—।

ওর আবার সেই "হুঁ"। বুঝলাম। এবার আমার কেটে পড়ার সময়। রীণার চিন্তা ওকে এখন ছেয়ে বসেছে। আমি আর সময় নষ্ট না করে বাড়ী চলে এলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। পড়ার চাপে রফিকের সঙ্গে আর দেখাই হয়নি। সময়ের সংব্যবহার করতেই এখন ব্যস্ত। রফিকের সাথে রাস্তায় হঠাৎ দেখা হওয়ার পর জানলাম, এই ফাঁকে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে।

সেদিন রফিকের ছোট ভাই রহিম বলেছিল—বড়দা, রীণাকে আমার খুব পছন্দ হয়। ভাবী হলে বেশ হবে। মাকে আমি বলেছি। মা বলেছে যে, তোমার মত থাকলেই হবে। তুমি—।

রহিমের মুখে রফিক এরকম কথা প্রত্যাশা করেনি। "তবেকি সব জানা জানি হয়ে গেল। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? সিরাজ তো কাউকে বলবে না।" মুহূর্তে সে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায়। হারিয়ে ফেলে সে তার উত্তর। সে যে রীণাকে কবে থেকে চেয়ে আসছে সে কথা সে কেমন করে বলবে। উত্তর আর দেওয়া হয়না।

রফিকের মানসিক পরিবর্তনে রহিম রীণার কথা এড়িয়ে যায়। বলে—বড়দা, বড়মা তোমাকে একবার ডেকেছিল।

—কেন, কেন কি হয়েছে?

"তা আমি কি করে জানবো। আমাকে বলেছিল, তোমার বড়দাকে একবার আমার কাছে আসতে বল।" কথাগুলো বলে রহিম সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে।

বড়মা, গফুর সাহেবের স্ত্রী। রফিককে যতটুকু স্নেহ, ভালবাসা দেওয়া দরকার বড়মা তা দিতো। বড়মার হঠাৎ এই তলব, রফিককে আরও ভাবিয়ে তোলে।

—বড়মা হয়তো রীণার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। সন্দেহটা দূর করে আসাই ভাল।

নানা রকম এলোমেলো চিন্তা করতে করতে রফিক তার বড়মার কাছে যায়। বড়মা এখন সবেমাত্র নামাজ পড়ে উঠেছে।

—বড়মা, আমায় ডেকেছিলে?

—হ্যাঁ, বাবা। তোমার সাথে কতগুলো জরুরী কথা আছে।

রফিকের গলা যেন শুকিয়ে যায়। বলে—জরুরী কথা কি বলোতো?

—দেখ বাবা রফিক, তুমি রীণাদের সঙ্গে মিশছো মেশো। কিন্তু বাবা, কোন রকম স্থায়ী সম্পর্ক,যদি গড়তে চাও তাহলে আমাদের ছাড়তে হবে। তুমি তো জান, ওরা কোনদিনই আমাদের সুনজরে দেখে না। তা ছাড়া, তোমাকে যতই ভালবাসুক লোক হিসাবে ওরা মোটেই ভাল না।

রফিক এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিল। "তার সন্দেহ তাহলে ঠিকই হয়েছে। কিন্তু বড়মা কেমন করে জানলো?" মাথার মধ্যে তার কেমন যেন সব জট পাকিয়ে যায়।

—বড়মা, তুমি কি বলছো; স্থায়ী সম্পর্ক—।

—তুমি বুদ্ধিমান, ভেঙ্গে বলার কোন প্রয়োজন নেই। আসল

কথা কি জান বাবা, দুনিয়াটা বড় পাল্টে গেছে। একটু দেখে শুনে কাজ করাই ভাল।

এ ব্যাপারটা যে নেহাতই তুচ্ছ না সেদিন তাই আমি রফিককে বলেছিলাম। এসব কথা যদি কামাল সাহেবের কানে যায় তো—কুরুক্ষেত্র করে ফেলবে। আমি এ ব্যাপারে যতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, রফিক কিন্তু অতটা হয়নি।

রফিক বললো—বুঝলি সিরাজ, এবার আর অত বাড়াবাড়ি করবো না। পাশ করেই বিয়ে। মা, বাবাকে ঠিক রাজী করে নেবে। তাছাড়া রহিমের যখন অত পছন্দ। আর বড়মা, গফুরচাচা ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

—তা তো হল, কিন্তু কামাল সাহেব রাজী হবেন? তোকে এখন ভালবাসে টাসে তো?

—ধুত। মিঞা বিবি রাজী তো কিয়া করেঙ্গে কাজী। আচ্ছা, কথাগুলো কি করে কানাকানি হল বলতো। রীণা কি ওর বান্ধবীদের কাউকে বলেছে?

আমি আর কথা বাড়ালাম না। বললাম—তা হবে হয়তো। যাক, ওসব কথা নিয়ে আর চিন্তা করে লাভ নেই।

রফিক নিজের মনে মনে মতলব এঁটে বলে—না, চিন্তার কিছু নেই। তবে, আসামী আমি খুঁজে বার করবোই। দেখি, কালকে রীণাদের বাড়ী একবার যাব।

সারা রাত রফিক এ কথাই ভেবেছে! "কে এসব প্রচার করলো?" একধারে সামান্য ভয়। অন্যদিকে বিরাট আনন্দ! তার মা যখন রাজী হয়েছে, পথ তখন সুগম। সকালে প্রাতঃরাশ সেরে রফিক রীণাদের বাড়ী যায়। কিন্তু আজকে ওদের ভালবাসার কৃপণতা রফিকের দৃষ্টি এড়ায় না।

"এতদিন পর এলাম অথচ কেউ আগের মত করে কথা বললো

না। রীণাকে তো দেখছি না। চিলে ঘরে আছে হয়তো।" কথাগুলো নিজের মনে মনেই রফিক বলে। কোন সাড়া না দিয়েই সে চিলে ঘরে পৌঁছে যায়। রীণা সেখানে গেঞ্জী বুনছিল।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে বেশ কায়দা করে রফিক রীণার চোখ দুটো চেপে ধরল। কোন রকম দেখার সুযোগই রীণা পায়নি।

মৃদু প্রতিবাদ করে রীণা বললো—কে, কে, চোখ ছাড়। লাগছে। চোখ ছাড় বলছি।

নিজের গলার স্বর পাল্টে রফিক বললো—ছাড়বো না, যতক্ষণ না নাম বলবে।

রীণা ভেবেছে, এ আর কেউ না, এ তার আগামী দিনের সাথী, ভবিষ্যতের স্বামী। তাই দ্বিধাহীন ভাবে বললো—ও বুঝেছি, নাজির দা।

রীণার কথায় রফিকের হাত যেন পাকা ফলের মত খ'সে পড়লো। হৃদয়ের কোথায় যেন একটা বেদনা অনুভব করলো।

—রফিকদা তুমি, হঠাৎ!

"কেন, হঠাৎ আসতে নেই বুঝি। তারপর কেমন আছ? কতদিন তোমার সাথে দেখা হয়নি।" কিঞ্চিৎ আঘাত প্রাপ্ত মনে কথাগুলো বললো রফিক।

রীণার মুখটা পাংশু হয়ে গেলেও চকিতে সে ভেবে নেয়, ধরা সে দেবে না রফিকের কাছে। অভিনয় তাকে করতেই হবে; যতদিন না নাজির তাকে আপন করে নেয়। ছলনার আশ্রয়ে নিজেকে লুকিয়ে বলে—খুব ভাল। তুমি কেমন আছ? এই চেয়ারটায় বস।

"হ্যাঁ ভালই আছি। ওটা কি বুনছো?" চেয়ারটা টেনে নিয়ে রফিক বসে পড়লো।

—দেখ না, নাজিরদা জোর করে গেঞ্জিটা বুনতে দিয়ে গেল।

আবার কাঁটা ফোটার যন্ত্রনা। তবুও রফিক বলে—তাই বুঝি।

"আচ্ছা, তুমি এতদিনে আসনি কেন বলতো? তোমার কথা কত মনে পড়েছে। কত রাত চোখের পাতা না মুড়েই কাটিয়েছি।" রীণা কৃত্রিম অভিমান করার চেষ্টা করলো।

—কেন, বেলাকে দিয়ে খবর দিলেই তো হতো।

অভিমানের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়ে রীণা বললো—তোমরা পুরুষরা বেইমান। মেয়েদের যে কত অসুবিধা থাকে তা জান না। এ'কদিনে আমার কথা একবারও মনে করেছিলে? নিশ্চয় না। এধারে আমি ভেবে ভেবে সারা।

কথাগুলো রীণা এমন ভাবে বললো যেন এক্ষুণি তার চোখ দিয়ে পানি ঝরে পড়বে।

রীণার এ অভিনয় রফিকের সরল মনে ধরা পড়ে না। আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে রফিক। মনে মনে ভাবে, সে কত অন্যায় করেছে রীণার ওপর। রীণার ছলনা ভরা ব্যথায় রফিক অত্যন্ত দুঃখ পায়। আবেগ মেশানো গলায় বলে—রীণা, আমার রাণী। সত্যি আমি অন্যায় করেছি। তুমি আমায় কত ভালবাস। আর আমি—।

—তুমি বড় দেরীতে বোঝ, তাই। তোমার পরীক্ষা কবে?

—কেন, নামাজ-টামাজ পড়ছো নাকি যে দোওয়া চাইবে।

—না, না।

—তবে?

—এমনি বলছিলাম। তুমি এবার উঠবে তো?

প্রেমালাপ রীণার মোটেই ভাল লাগছিল না। অন্যকথা পাড়ার চেষ্টা করে। ভয় হয়—এই বুঝি নাজির এসে পড়বে।

রফিকের মন তখন প্রেম রসে সিক্ত। ভিজিয়ে দিতে চায় সে রীণার মন প্রাণ।

—এক্ষুণি! এইতো এলাম। রীণা, তোমার হাতখানা দেখি, কতদিন এর ছোঁয়া পাইনি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রীণা হাত বাড়ীয়ে দেয়। স্পর্শে রফিক কল্পনার জগতে পৌঁছে যায়। আবেগে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কবিতার সুর।

ওগো সুন্দরী, ওগো মন হারিনী,
রিক্ত আমি, হৃদয় মোর যাইতে নারি।
তোমার পরশে, হিল্লোলে বসুন্ধরা,
তোমা বিনা কেমনে ভাসাই তরী।

—উহঃ, কি করছো! ছাড়, ছাড়। এখুনি মা এসে পড়বে।

—আসুক তোমার মা, আমি করিনা তাহারে ভয়; ওষ্ঠে তোমার পরাগ, আমি হতে চাই সেথা লয়।

—ছাড়—না···আ···আ···।

—কেন প্রিয়তমে এত দূরীকরণ, কার লাগি মোরে এত সরম।

কিছুটা জোর করেই রীণা তার হাত ছাড়িয়ে বলে—ঐ পায়ের আওয়াজ পাচ্ছ? কে আসছে! মা বোধ হয়!

মনের যত উচ্ছাস, যত আবেগকে শাসন করে চলে এসেছিল রফিক। রীণা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। অদৃষ্ট তার হাতে হাত মিলিয়ে রফিকের বজ্রবাঁধন থেকে মুক্ত করে।

দশম পরিচ্ছেদ

নিস্তব্ধ, নিঝুম রাত। ঘুট ঘুটে অন্ধকার। অমাবস্যার কবলে প্রহরের কাঁটা এগিয়ে চলে ধাপে ধাপে। অপেক্ষা করে আগামী দিনের উজ্জ্বল অতিথি বরণে। কিন্তু হায়, নিয়তীর কি বিধান, কত পাপ-পূণ্য, কত সুখ-দুঃখ বয়ে যায় এই অন্ধকারের বুক চিরে। কেউ তার হদিস পায়না।

দরজায় খটখট আওয়াজে নাজির বুঝতে পারে সাগর এসেছে। এরকম বোঝা পড়া তাদের আগেই ছিল। চাপা গলায় সে বলে—সাগর, ভিতরে এস।

খুব সন্তর্পণে দরজাটা দিয়ে সে আবার বলে—বল এবার রফিক কি করেছে?

সাগর মনে মনে বেশ ভয় পায়। বলে—কেউ শুনে ফেলবে না তো?

"না, না।" নাজির জানতো রাত বেশ হয়েছে। কেউ কোথাও জেগে নেই। তাদের এ আলোচনা কেউ টের পাবে না।

একটু জিরিয়ে কিছুটা দম নিয়ে সাগর বলে—হ্যাঁ, তুমি তো সেদিন বললে যে, রীণার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। তা, রীণা তোমায় পছন্দ করে, ভালবাসে ?

—কেন বাসবে না ? শুধু কি রীণা, ওদের সবাই আমায় ভালবাসে। সবায়ের বিয়েতে মত আছে।

"তুমি একেবারে হাঁদারাম। রীণা তোমায় ভালবাসে না ছাই। রীণা রফিকদাকে ভালবাসে।" দরজার দিকে তাকিয়ে নেয় সাগর।

"কি আজেবাজে কথা বলছ ?" নাজির আশ্চর্য হয়ে যায়।

—আজেবাজে নয়, ঠিকই বলছি। রফিকদা রীণাকে খুব ভালবাসে। তুমি বিহার যাওয়ার পর থেকেই……।

"এতসব কথা তুমি জানলে কি করে !" নাজিরের কৌতূহল বেড়ে যায়।

—রফিকদা বেলার হাতে রীণার কাছে চিঠি পাঠায়। রীণাকে নিয়ে কবিতা লেখে। রীণার কথা ওর মুখে মুখে।

—তুমি ঠিক বলছো ?

"মিথ্যে বলে লাভ ?" সাগর চ্যালেঞ্জ করে।

—সত্যি বোলেই বা তোমার লাভ কি ?

চোখের তারাগুলো হঠাৎ বাঘিনীর মত জ্বলজ্বল করে উঠলো সাগরের। নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হল। বিকৃত কণ্ঠে বললো,— "প্রতিশোধ, যেমন করেই হোক প্রতিশোধ আমায় নিতেই হবে। আমায় মিথ্যে সন্দেহ করে কাঁদিয়েছে।" সাগরের চোখে সত্যিই পানি এল। চোখ দুটো মুছে দৃঢ় কণ্ঠে বললো—আমি রফিকদাকে ছাড়বো না। বড় ভালবাসতাম ছোটবেলা থেকে। শেষে আমায় প্রতারণা। নাজিরদা, তুমি চুপ করে আছ কেন ? তোমার প্রেমি-

কাকে ছিনিয়ে নেবে, আর তুমি চোখ বুঁজে থাকবে; বল, বল……ব…ল!

নাজির তার বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে। মনে মনে সে ভাবতে থাকে—এত আশা, এত ভালবাসা আর শেষে কিনা—

রাগে, দুঃখে যুদ্ধেহারা সৈনিকের মত হয়ে যায় নাজির। সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে রফিকের ওপর। রাগে ফুলতে ফুলতে সে বলে—শাস্তি রফিককে পেতেই হবে। তবে সে শাস্তি বুদ্ধিমানের শাস্তি; যা ওর জীবনকে একেবারে পঙ্গু করে দেবে। ওর বড় গর্ব, গ্রামের ভাল ছেলে। আজ পর্যন্ত নিজেও তা জেনে এসেছি। কিন্তু এবার আমি ওর মুখোস খুলে দেব। সাগর, তুমি আমার সাথে সাথ দেবে তো?

—নিশ্চয়ই, বদলা, আমার বদলা চাই।

—ঠিক আছে। আমাদের প্রথম কাজ হল রীণার প্রতি ওর ভালবাসার লিখিত প্রমাণ জোগাড় করা। আর সেটার ভার তোমার উপর। যেমন করেই হোক রফিকের লেখা একটা চিঠি তোমায় চুরি করতেই হবে। ব্যাস, দেখবে ব্যাটা কেমন ঘু ঘু ধরার ফাঁদে পড়বে।

"কাজটা বড় শক্ত। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থেক নাজিরদা; সমাধান আমি করবোই।" সাগর বাড়ী যাওয়ার জন্যে উঠে পড়ে। বলে—রাত অনেক হল। মা আবার বকবেন।

—কিন্তু মনে রেখ সাগর, কথার নড়চড় হলে তোমার আগুন তোমাকে জ্বালাবে।

"তুমি না বললেও আমি তা জানি নাজিরদা।" সাগর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। অন্ধকারে গা ভাসিয়ে চুপি চুপি সে তার ঘরে ঢুকে পড়লো।

সময় চলে যায় মহাকালের গর্ভে। কে তার হিসাব রাখে। শুধু মনে থাকে অতীতের টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো। রফিকের, আমার পরীক্ষা হয়ে গেছে। রফিক চলে গেছে কাশ্মীরে। আমি চাকরী খুঁজছি। দেখতে দেখতে মাস পার হয়ে গেল। নির্দিষ্ট তারিখে কাশ্মীর থেকে রফিক ফিরলো। সংবাদটা আমি মাজবুলের কাছে জানলাম। কালবিলম্ব না করে রফিকদের বাড়ী এলাম। বাড়ীতে বেশ ভীড় হয়েছে। নানা জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে ও।

আমাকে দেখে রফিক উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে বললো—সিরাজ, কেমন আছিস বল?

—ভাল, তুই?

"খুব ভাল। দেখ একবার।" হাতদুটো তুলে ও শরীরটা একবার দেখিয়ে দিল।

কিন্তু ওর চোখে মুখে রাতজাগা ভ্রমণের ক্লান্তির ছাপ দেখে বললাম—সে পরে দেখবো, তুই প্রথমে নেয়ে খেয়ে নে। আমি তোর ঘরে আছি।

আধঘণ্টার মধ্যে কাজ মিটিয়ে রফিক এল। সাথে সাথে সাগর কতকগুলো আপেল দিয়ে গেল।

— এগুলো কাশ্মীর থেকে এনেছি। খুব সস্তা সেখানে।

একটা আপেল তুলে নিয়ে বললাম—বেশ সুন্দর জিনিস। তারপর কাশ্মীর কেমন লাগলো বল।

—অপূর্ব, অদ্ভুত! সত্যিরে সিরাজ, আমরা যেন একটা গণ্ডির মধ্যে পড়ে আছি। এই বিশাল পৃথিবীর যে কত রূপ, কত গন্ধ তা বাইরে না গেলে বোঝা যায় না। আমার জীবনে কাশ্মীর ভ্রমণ এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। প্রকৃতির রাজ্যে যে এত সুন্দরের ছড়াছড়ি; এত আকর্ষণের রঙবেরঙের জাল বিছান সেটা আমরা ক'জন জানি?

জানিস, পাঠানকোট থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত যে বিরাট দূরত্ব, সেটা বাসে ত্'দিন যেতে লেগেছে। অকল্পনীয় এই দুর্গম গিরিপথ মনের মধ্যে রোমাঞ্চ এনে দেয়। যে দিকে তাকাই শুধু পাহাড় আর পাহাড়। মনে হয় যেন পাহাড়ের রাজ্যে এসে গেছি। বিরাট বিরাট শৃঙ্গগুলো যেন আকাশ ছুঁইছুঁই করছে। পাথরের বুক চিরে পাইন গাছগুলো উঠে গেছে অনন্তে। কখনও চড়াই, কখনও উতরাই। প্রতিটি মুহূর্ত নতুন নতুন অনুভূতি সঞ্চার করে। মাঝে মাঝে কোথাও উপত্যকা। নীচের দিকে তাকালে শিহরণ জাগে। পুলকিত হয়ে যাই, নীচে বহু নীচে ছোট্ট ছোট্ট কাঠের বাড়ীগুলো দেখে। আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, উঁহাকে লোগ ক্যায়সে জীবন বিতাতা ?

উত্তরে ড্রাইভার বললো, ও লোগ নীচেসে ও রাস্তা পাকাড়কে উপর আতা; ফির সহরকে তরাফ কামকে লিয়ে যাতা। আশ্চর্য।

এখানকার সবচেয়ে মনোরম যেটা, সেটা হল ঝর্ণা। ঝর্ণার এই রূপ যেন কোন মানসীর উত্তাল যৌবনের সাক্ষী। কল কল স্বরে চলে যায় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। তার আন্দোলনে আন্দোলিত হয় দেহের প্রতিটি স্নায়ু। চোখের পাতা আর মোড়ে না। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে যায় এর মাঝে।

রফিক আর কিছু বলার আগেই আমি বললাম—তা না হয় হল। আসল কাশ্মীর, মানে শ্রীনগরটা কেমন লাগলো ?

—সত্যি কথা বলতে কি সিরাজ। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক রূপ কেউ বলে বোঝাতে পারবে না। এটা এমন এক জায়গা যা চোখ দিয়ে দেখে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে। অনুভবের মধ্যেই কাশ্মীরের সৃষ্টি। চারিদিক পরিষ্কার ঝকঝকে। তারই মাঝে ফুলের মেলা। বিশাল প্রশস্ত রাস্তা। তারই গা বেয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে গগনস্পর্শী চিনার গাছের দল। তারা যেন সতর্ক প্রহরীর

মত আগলে আছে তাদের রাস্তাকে। যতদূর তাকাই এর শেষ নেই। কোন দিগন্তে এর সমাপ্তি কে জানে। সন্ধ্যেবেলায় যখন ডাল লেকে শিকারায় চাপতাম, তখন মনে হত, এ এক স্বপ্নপুরী। দেখতে দেখতে তেজহীন রক্তেরাঙা সূর্য পাহাড়ের গায়ে লুকিয়ে পড়তো। কোমল, স্নিগ্ধ রশ্মি ছড়িয়ে দেখা দিত পূর্ণিমার চাঁদ। ঠিক এসময়ে বেশী করে মনে পড়তো রীণার কথা।

—এতে আবার রীণার কথা কেন? বেশ তো হচ্ছে।

—আরে রীণা ছিল বলেই তো এত কথা।

—তার মানে?

ছুরিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে রফিক বললো—সে অনেক কথা—পরে হবে। নে, এখন আপেলগুলো পেটে পোর দেখি।

দুজনে মিলে বেশ কয়েকটা আপেল খাওয়া হল। আসলে সেগুলো আপেল না, আমরু; পরে ওর কাছ থেকে জানলুম।

এতখানি পথের বাস জার্নি আবার ট্রেন জার্নি, তাই ওকে বিরক্ত না করে বললাম—আমি তাহলে এখন চলি। পরে সময় করে আসবো। আরো তো অনেক—বিশেষ করে রীণার কথা বাকি রইলো। কি বলিস।

—ঠিক আছে। আমি বরং একটু ঘুমিয়ে নিই। সাগর, এই সাগর, মাকে বলে দে দুপুরে আমি খাব না।

সাগর এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। রীণার কথা শুনে তার মন বিষিয়ে উঠেছে। প্রতিহিংসার দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে তার মনে। ক্ষোভে, দুঃখে তার সারা অঙ্গ জ্বলতে থাকে। রফিকের কথায় সাড়া না দিয়ে রাগে চুপি চুপি সে চলে যায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে জানালাটা খুলে দিতেই একরাশ আলোয়

ঘর ভরে গেল। বাইরের পরিচ্ছন্ন সূর্য কিরণ ছড়িয়ে পড়লো সারা ঘরটায়। মুখ বাড়িয়ে দেখি, বাইরের গাছগুলোয় হেমন্তের শিশির পড়ে। তাতে প্রভাতের সূর্যরশ্মি চিকচিক করছে। কত কোমল, কত উজ্জ্বল। হঠাৎ বাবার গলার আওয়াজ পেলাম।

—সিরাজ, মুখ হাত ধুয়ে আমার ঘরে একবার এস।

গতকালকে আমার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। First Class নিয়ে পাশ করেছি। মনে হল চাকরীর ব্যাপারেই হয়তো বাবা ডাকছেন। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে বাবার কাছে গেলাম।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বাবা বললেন—ব্রীজ এ্যাণ্ড রুফে তোমার চাকরীর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তোমাকে হয়তো ওরা ছোট-নাগপুর পাঠিয়ে দেবে। কালকে একবার ওদের অফিসে গিয়ে appointment letter-টা নিয়ে আসবে। কেমন!

আজকালের বাজারে চাকরী পাওয়া যে কত মুশকিল সে সম্পর্কে খুব বেশী অভিজ্ঞতা না থাকলেও আন্দাজ করতে পারতাম। সততা আজ অসতের পদতলে। আমার ব্যাপারটা অবশ্য একটু স্বতন্ত্র। সুপারিশের আওতায় এলেও প্রকৃত যোগ্যতা আমার ছিল। তবুও এত তাড়াতাড়ি এরকম একটা চাকরী পেয়ে যাব আশা করিনি।

বাবার মুখের কথা শুনে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল, স্পষ্ট ছবি যেন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। আনন্দে তখন আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। মন বলছিল, কতক্ষণে এ সুসংবাদটা রফিককে জানাবো। ও কতো খুশী হবে।

সন্ধ্যে হয় হয়। পশ্চিমের আকাশে সূর্য তখন অস্তাচলে। এত মায়া, এত ভালবাসাকে ছেড়ে, সে যেন অতল গহ্বরে যেতে চাচ্ছে না। টুকুরো টুকরো মেঘ রক্তেরাঙা হয়ে গেছে তার সাথে। কি তাদের অভিপ্রায়, মুক্তি? কেউ জানে না। অসহনীয় বুকভরা আনন্দ নিয়ে রফিকের বাড়ী এলাম। নীচে চাচীমার সাথে দেখা। কোন রকম

ভূমিকা না করেই বললাম—চাচীমা, ছোটনাগপুরে আমি চাকরী পেয়ে গেছি। আসছে সপ্তাহে হয়তো আমাকে যেতে হবে।

—তা বেশ বাবা, বেশ। আগামী সপ্তায়ই যেতে হবে?

—হ্যাঁ, রফিক উপরে আছে তো? ওকে খবরটা জানিয়ে আসি।

—যাও বাবা।

লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে চলে এলাম। হৃদয়ে তখন আনন্দের বান উঠেছে। চিত্ত চঞ্চল। যেন কত কম বয়স। ছেলেমানুষের মত রফিকের গলা জড়িয়ে ধরলাম।

—রফিক আজ তোকে একটা সুসংবাদ দেব। প্রতিদানে আমায় কি দিবি বল?

"আরে সংবাদটা শোনা তারপর—।" রফিক একটু অবাক হয়েছিল।

ধৈর্যের বাঁধ তখন আমার ভেঙ্গে গেছে। বললাম—আমি First Class নিয়ে পাশ করেছি এবং ছোটনাগপুরে Assistant Engineer-এর চাকরী পেয়েছি।

জীবনে অনেকের বন্ধুত্ব দেখেছি। কিন্তু আমার রফিকের বন্ধন ছিল অবিচ্ছেদ্য, অখণ্ডনীয়। আমরা দুটি প্রাণী হলেও হৃদয় ছিল এক। আমার আনন্দে ওর হৃদয়ে ওঠে তুফান।

আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে,—"Congratulation, এই নে তোর বকশিস।" গভীর চুম্বন এঁকে দেয় আমার গালে। তারপর এক দীর্ঘ চিঠি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—দেখ, কাশ্মীরে বসে বসে লেখা।

—এ তো রীণার চিঠি।

—হ্যাঁ, কালকে রীণাকে দিয়ে আসবো।

চিঠিটা রীণার হলেও; এর একটা বাহ্যিক আকর্ষণ ছিল। অভি

যত্নে লেখা দীর্ঘ দু' পাতার চিঠি। তাতে সুন্দর নক্‌সা কাটা।

প্রাণেশ্বরী,

কাশ্মীরের মত জায়গায় এসেও দেহমন আমার ব্যথায় জর জর। এত মুক্ত পরিবেশে এসেও সোনার শিকল দিয়ে আমি আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা। তুমিই আমার মুক্তি। তোমার ভালবাসার ফাঁদ এমন করে জড়িয়েছে যে, ছাড়াবার উপায় নেই। মৃত্যু পর্যন্ত এ ফাঁস জড়িয়ে থাকবে আমায়। তুমি আমার দুঃখের, সুখের বন্ধু। তোমার আর্বিভাব আমার জীবনে এক আশ্চর্য আশ্রয়। এই সৃষ্টির জগতে বহু নরনারী, কিন্তু তুমি সুন্দর ও জ্যোতির্ময়ী। ভূ-ভারতে আর দুটি নেই। এখানে বসে এক মিনিটের জন্যে আমার মন তোমাকে চোখের দেখা দেখতে চায়। চোখে দেখাই আমার অসীম তৃপ্তি। এখানে আনন্দ আছে, উল্লাস নেই, অপূর্ব তৃপ্তি আছে কিন্তু রসের উত্তেজনা নেই। হেথা তুমি দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য। দিগন্ত প্রসারিত বিস্তৃত তুষার মালায় তোমার কল্পনা, যুগ-যুগান্তরের স্বপ্ন বিরাজমান। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ধারে গিয়ে মনে হয়, হেথা আলো নেই, বায়ু নেই, আকাশ নেই। আমার কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায় ওই পাহাড়ের গর্ভে। আমি নির্বাক, নিষ্ক্রিয়, নিঃসম্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

তুমি হয়তো ভাবছো, তোমাকে আমি ভুলে গেছি। দেহের রক্তকেও তো মানুষ ভুলে যায়। অথচ সবসময় সে জীবনের রস যোগায়, প্রাণকে সঞ্জীবিত করে; শরীরকে সচল ও কর্মময় করে রাখে। তোমার নাম স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল জুড়ে রয়েছে। তোমাকে ভোলা সহজ নয়। তুমি.........

চিঠিটা পড়া আর শেষ হয় না। রহিম বড়দা-বড়দা বলে উপরে উঠে আসে।

—বড়দা তোমার রেজাল্ট বেড়িয়েছে। আমি হাওড়ায়

গিয়েছিলাম, সেখান থেকে গেজেট এনেছি। তোমার রোল নাম্বারটা কত?

"কয় দেখি, আমায় দে।" রফিক উঠে পড়ে।

রহিমের হাত থেকে গেজেটটা নিয়ে বললাম—না রফিক আমার হাত দিয়েই তোর সৌভাগ্যের উন্মোচন হক।

"আমার কিন্তু ভয় করছে। যদি—।" রফিক দুর্বল হয়ে পড়ে।

—ধুত, রোল নাম্বারটা বল তো।

—How. (Sc.) 985। রফিকের ঠোঁট দুটো নিমেষে কেঁপে ওঠে।

একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে সবায়ের চোখ ঐ গেজেটের উপর ঘোরা-ফেরা করে। হৃদয়ের এক একটা স্পন্দন যেন এক একটা মুহূর্ত। কি হয়, কি হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে লক্ষ্যস্থলে আমার চোখ পড়লো। চেঁচিয়ে উঠলাম হিপ, হিপ..হুরে..।

—সিরাজ দা।

—আরে রফিক ডিসটিংসন্ নিয়ে পাশ করেছে।

—"সত্যি, মা, ওমা।" চেঁচাতে চেঁচাতে রহিম চলে যায়।

আনন্দে রফিক যেন অভিভূত হয়ে গেছে। পূর্বক্ষণে কত ভয়, কত আশঙ্কা, আর পরক্ষণে এত আনন্দ। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে—সিরাজু, তুই ভাগ্যবান। তোর স্পর্শেই যেন গেজেটের পাতার অক্ষরগুলো বদলে গেল। আমি তো ভাবতেই পারিনি!

—তুই কোন জিনিসটা কবে ভেবেছিস। যাক, তোর এই সাফল্যে আজ তাহলে একটি পার্টি দেওয়া যাক, কি বল!

"নিশ্চয়, রহিম, এই রহিম।" সিরাজ রহিমকে ডাকে।

রফিকের পাশের কথা শুনে চাচীমা কিছুটা ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢোকে। বলে—বাবা রফিক, তুমি নাকি পাশ করেছ ?

রফিকের বলার আগেই আমি বললাম—হ্যাঁ চাচীমা, শুধু পাশ নয় distinction নিয়ে পাশ করেছে।

চাচীমার মুখটা আনন্দে ঝলমল করে উঠলো। "শুনে খুশী হলুম বাবা, বুকটা আমার জুড়িয়ে গেল। তোমরা সকল কাজে সেরা হবে, সবার বড় হবে এটাই তো আমাদের কামনা। তোমরা বস, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

—না মা, আজ আর চা নয়। আমরা মিষ্টির প্রোগ্রাম ঠিক করেছি। রহিম, তুই নাজিরকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি, বড়দা কি এক জরুরী ব্যাপারে এখুনি ডেকেছে। তাড়াতাড়ি আসবি।

চাচীমা ও রহিম চলে গেলে আমি বললাম—এবার তো রীণার সাথে দেখা করতে হয়। এই বিরাট সাফল্য, এত বিরাট চিঠি।

—হ্যাঁ, শীঘ্রই রীণার কাছে যেতে হবে। ও কত খুশী হবে বল তো!

তুষের আগুনকে উসকে দিই। বলি—তা তো হবেই। মনের মানুষকে কাছে পেলে কে না খুশী হয়। ওই রহিম আসছে।

বড়দা, নাজিরদা এল না, এত করে বললুম !

—কি করছে ও ?

কামালদার সঙ্গে ওনার ঘরে গল্প করছে। তোমার কথা বলতে কামালদা রেগে গেলেন। বললেন যে, এখন নাজির যেতে পারবে না। কামালটা একনম্বরের হারামজাদা লোক। আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না ওনাকে।

—হুঁ, তুই যা। দেখলি সিরাজ, নাজিরের কত পরিবর্তন ঘটেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ওর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নয়! জরুরী খবর, বলে পাঠালাম ; অথচ এল না। অকৃতজ্ঞ! চল আমরা মিষ্টির দোকানে যাই।

আমি আর কিছু মন্তব্য করলাম না। দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন মঙ্গলবার। বেলা চারটে হবে। অফুরন্ত আনন্দ বার্তা নিয়ে রফিক যায় রীণার কাছে। তার মনে রঙবেরঙের বাসনা। আজ সে তার রীণাকে উপহার দেবে কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ উপহার এই বিরাট প্রেমপত্র। রফিক জানে এসময় রীণা চিলেঘরেই থাকে। খুব আস্তে আস্তে, একপা একপা করে রফিক উঠতে থাকে। রীণার মেজদার ঘর থেকে হঠাৎ রীণা-নাজিরের গলার শব্দ শুনে রফিক থমকে দাঁড়ায়। কেমন যেন তার মনে সন্দেহের সাড়া জাগে। শব্দ না করে সে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

নাজির আর রীণা তখন ভবিষ্যতের বাসা বাঁধছে। মিষ্টি করে, আদর দিয়ে নাজির রীণাকে বলছে—জান রীণা, তোমরা মেয়েরা সরোবর; আমরা হলাম মরাল। আর দেরী নেই, শীঘ্রই সরোবরে সাঁতরে বেড়াবো।

রীণা মনে মনে খুব আনন্দিত হয়। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি এনে বলে—তোমার গলায় বরমালা দিলে তো!

—বটে!

দুজনে হাসতে থাকে মনের আনন্দে। এদিকে রফিকের মনে হয়, ভূমিকম্প হচ্ছে বোধ হয়। পৃথিবী দুলছে, দুলছে আকাশ, দুলছে গাছপালা, দুলছে অস্তমিত সূর্য। আর সে? সেও দুলছে। দুলছে তার রক্ত, দুলছে চোখের দুটো মনি, দুলছে ইহকাল-পরকাল। তার ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে বলতে, এ অন্যায়, এ পাপ, এ ভালবাসা নয় ব্যভিচার। কিন্তু রফিকের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। সাঁতার না জেনে নিরূপায় মানুষ যেমন তৃণ ধরতে গিয়ে পানির ভেতর তলিয়ে যায়, রফিকও যেন তলিয়ে যায় কোন পাতালে। ক্ষোভে অপমানে, দুঃখে জর্জরিত হয়ে তখন সে ঈশ্বরকে দোষারোপ করতে থাকে,— "হে ঈশ্বর, আমার বিরুদ্ধে তোমার এ কোন চক্রান্ত? এ আমি কি দেখলাম; কি শুনলাম; আমার কোন পাপের শাস্তি তুমি দিলে?" কোন রকমে নিজেকে সামলে রফিক বাড়ী চলে আসে।

আগামীকাল আমায় ছোটনাগপুরে যেতে হবে। সকাল পাঁচটায় ট্রেন। কাল সকালে রফিকের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব না। তাই ভাবলাম, রফিকদের বাড়ী ঘুরে আসি।

আমি যখন রফিকের ঘরে ঢুকলাম তখন রফিক বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। একটা শব্দ আমার কানে আসছিল।

"রফিক হাসছে না কাঁদছে;" কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম—রফিক, এই রফিক, এ-ই রফিক। তোর কি হয়েছে বল তো? আরে, তুই কাঁদছিস! চোখ দুটো কি ভীষণ লাল হয়ে গেছে। কি ব্যাপার বল তো? এই কথা বল, কিরে!

"আমার সর্বনাশ হয়েছে রে সিরাজ। নাজির আমার সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে।" রফিক আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

আমি অত্যধিক আশ্চর্য হলাম, বললাম—ছিনিয়ে নিয়েছে? কি ছিনিয়ে নিয়েছে, নাজির?

বৈকালে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রফিক আমায় শোনাল। আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। কি বলে যে রফিককে শান্ত করবো তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না।

"রীণা শেষে বেইমানি করলো। রফিক কত না দুঃখ পেয়েছে। কেউ না জানুক আমি তো জানি, রীণাকে ও কত ভালবাসে." নিজেকে স্বাভাবিক করে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বললাম—এই জন্যে এত দুঃখ, এত কান্না। আরে, রীণার মত কত মেয়ে আমার জীবনে এল আর গেল। মেয়েরা একটু বেইমানই হয়। তাই বলে আমরা পুরুষরা হার স্বীকার করবো? তোকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, তুই পুরুষ। পুরুষের কখনও মেয়ের অভাব হয়েছে?

—না-না, সিরাজ। সে আমি পারবো না। তুই তো জানিস, রীণাকে আমি যুগ যুগ ধরে ভালবাসি। কেমন করে তা ভুলে যাব।

ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললাম—ওরে পাগল, গোবরে কখনও পদ্ম ফোটে না। রীণার কাছ থেকে যা পেয়েছিস সেটাই যথেষ্ট। ঐ হিংসুটে, ঝগড়াটে বাড়ীর মেয়ের কাছ থেকে কি আর আশা করা যায়, বল। ভাগ্য ভাল যে, মুখোশটা তাড়াতাড়ি খসে পড়েছে; নইলে ভবিষ্যতে আরো কত বিপদ আসতো।

"রীণাকে আমি ভুলতে পারবো না সিরাজ। আমার ভালবাসা যদি পাপ হত, মিথ্যে হত তাহলে হয়তো পারতাম। কিন্তু আমার ভালবাসা যে পবিত্র, নির্মল। না, না, না, আমি কিছুতেই মুছতে পারবো না।" আবার কিছুটা পানি রফিকের চোখ বেয়ে নেমে এল।

—তুই কি তাহলে কেঁদে কেঁদেই দিন কাটাবি। চাচাজী যদি জানতে পারেন। কি হবে বল তো!

—কেউ জানবে না। কেউ বুঝবে না আমার দুঃখ, আমার বেদনা, আমার কান্না। তুই আমার প্রাণের বন্ধু। তোর সামনে না কাঁদলে যে আমি পাগোল হয়ে যাব রে!

—তোর যখন আমি প্রাণের বন্ধু তখন, আমারো তো একটা অধিকার আছে। হতাশার স্রোতে নিজেকে যদি ভাসিয়ে দিস, আর বন্ধু হয়ে আমি যদি নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে প্রাণের বন্ধু হওয়ার সার্থকতা কোথায়। সত্যি যদি আমি তোর প্রাণের বন্ধু হয়ে থাকি তাহলে আমার দুটো অনুরোধ তোকে রাখতে হবে। আমার প্রথম অনুরোধ, রীণার চিন্তা দূর করতে হবে। আর দ্বিতীয় অনুরোধ, কারো সামনে কোন দুঃখ প্রকাশ করা চলবে না। চুপ করে আছিস যে, রাখবি তো?

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রফিক বললো—দ্বিতীয় অনুরোধ আমি অক্ষরে, অক্ষরে পালন করবো। কিন্তু প্রথমটা পারবো না। তবে, চেষ্টা করবো।

মনে মনে একটু সাহস পেলাম। বললাম—চেষ্টা করলেই সব হবে। যাক, আমার কথাটা এবার শোন। কালকে সকাল পাঁচটার ট্রেনে আমি ছোটনাগপুরে চলে যাচ্ছি। কালকে তো আর আসা হবে না, তাই এখন এলাম। চিঠিপত্র দিস তাহলে। রাত অনেক হল। চলি। মা হয়তো আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

রফিকের কাছ থেকে এসে একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল—রফিক কি রীণাকে ভুলতে পারবে? ভারিক্কি চালে বেশ তো গাদা গাদা মিথ্যে কথা বলে সান্ত্বনা দিয়ে এলাম; কিন্তু ভোলা কি সহজ?

ঘটনাটা যদি আমার জীবনেই ঘটতো, আমি কি সহজে ভুলতে পারতাম!

সেদিন খোদার কাছে প্রার্থনা করলাম—হে খোদা, আমার শুভ-গমনের প্রাক্কালে রফিকের জীবনে এ কোন অতিথির আগমন। তুমি সবায়ের রক্ষাকর্তা। আমার প্রাণের বন্ধুকে রেখে গেলাম। তুমি দেখ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তিন মাস হয়ে গেছে আমি ছোটনাগপুরে চলে এসেছি। কাজের মাঝে সময়গুলো হু-হু করে কেটে যাচ্ছে। এর মধ্যে রফিককে আমি অনেকগুলো চিঠি দিয়েছি। কিন্তু তার কোনটারই জবাব সে দেয়নি। পাহাড়ে ঘেরা এই ছোট জায়গাটাতে বেশ মন বসে গেছে। কিন্তু যখনই রফিকের কথা মনে হয়, তখনই দেশে ফিরতে ইচ্ছা করে।

দু একদিনের মধ্যে হাতে কয়েকটা ছুটি এসে গেল। বাড়ীর দিকে মনটা যেন ছুটে চললো। রাতের ট্রেনেই চেপে বসলাম।

বাড়ী যখন ফিরলাম, তখন শরীরটা ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে। সেদিন আর রফিকের সাথে দেখা করা হয়নি। পরের দিন বেলা নটা নাগাদ রফিকদের বাড়ী গেলাম। ঢোকার পথে রহিমের সাথে দেখা। আমাকে দেখে খুব আনন্দ পেল, বললো—সিরাজদা কবে এলে?

—কালকে সন্ধ্যায় এসেছি। ভাল আছ তো? চাচাজী, চাচীমা, রফিক কেমন আছে?

"হ্যাঁ সবাই ভাল আছে। শুধু রফিকদা -।" রহিমের কথা শেষ হয় না মুখটা মলিন হয়ে যায়। মাথা নীচু করে মাটির দিকে সে তাকিয়ে থাকে।

—রফিকের কি শরীর খারাপ? কোথা সে?

রহিমের চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। বলে—তুমি বাড়ীতে এস, সব বলছি।

আমরা নীচের ঘরে বসলাম। আমার তখন রীতিমত চিন্তা ঢুকে গেছে মনে, বললাম—কোন দুঃসংবাদ নয় তো? তাড়াতাড়ি বল।

—দুঃসংবাদই বটে! তুমি যেদিন এখান থেকে চলে গেলে, ঠিক তার তিনদিন পরের ঘটনা। বড়দা কাশ্মীরে বসে রীণাকে যে চিঠিটা লিখেছিল, সেটা সাগর চুরি করে নাজিরদার হাতে দেয়। তারপর সেটা কামালদার হাতে পড়ে। ব্যাস কুরুক্ষেত্র! সেই চিঠি নিয়ে কি হইচই, কি চেঁচামেচি। প্রচুর লোক জমা হয়ে গেল কামালদার চেঁচামেচিতে। কামালদা চেঁচিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন —দেখ, তোমরা, আমার নিরীহ বোন, রীণাকে নিয়ে রফিকের কি অপকীর্তি। আমার বোন তো বেশ্যা নয় যে, অধর্ম করতে যাবে! কিন্তু রফিকের কি সাহস, ও বাঁদর হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে যায়। চাঁদের মত আমার বোনের জীবন কলঙ্কিত করতে চায়। কেন, কেন এই শত্রুতা? ঘরে কি ওর মা বোন নেই, তাদের সঙ্গে এসব করলেই তো ভাল হত।

পাড়ার বহুলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কামালদার লেকচার শুনছিল, আর হাসছিল। আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। "প্রেম কি শুধু বড়দা করেছে, রীণা করেনি? এক হাতে কি তালি বাজে?" আর সহ্য করতে পারলাম না। ছুটে গিয়ে মারলাম এক ঘুসি,

কামালদার মুখে। ব্যাস গল গল করে রক্ত বের হতে লাগলো। আমাদের শত্রুপক্ষের কয়েকজন তখন আমায় ধরে কামালদার বাড়ীতে পোরার চেষ্টা করছে। ওদের ইচ্ছা ছিল ঘরে পুরে বেশ করে পিটবে। কিন্তু আল্লার কি মেহেরবাণী, বড়দা কোথা থেকে ঝড়ের মত এল। দলের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমায় ছোঁ মেরে বাইরে নিয়ে এল। এর মধ্যে আব্বা, চাচারা সব এসে পড়লেন। বিপক্ষদল পুলিসে জানাবে বললো। কিন্তু তুমি তো জান সিরাজদা, আব্বা থানা পুলিস কেন, ঝগড়াই পছন্দ করে না। শেষে ঠিক হল রাত আটটায় বিচার হবে।

সেদিন বড়দা কিছুই খেল না, কারো সাথে কথাও বললো না। বিকেলে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি, বড়দা রীণার লেখা কতকগুলো চিঠি বের করে দেখছে আর কাঁদছে। বড়দাকে দেখে আমার খুব দুঃখ হচ্ছিল।

বিচার বসলো পাড়ার মুরুব্বীদের নিয়ে। তাছাড়া পাড়ার যুবক, বয়স্ক এবং আঁধারে, আড়ালে মেয়েরাও ছিল। সে এক বিরাট কাণ্ড। প্রথমে আমার বিচার হল। কামালদা আমার মা বোনকে নিয়ে অশ্লিলতা করেছে, তাই আমি মেরেছি; সুতরাং বেকসুর খালাস, এইবার বড়দার বিচার। পাড়ার বিচারপতি, রুহুল মিঞা, প্রথমে বড়দাকে প্রশ্ন করলেন—রফিক, এ চিঠি কি তোমার হাতে লেখা?

বড়দা নরম গলায় বললো—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এ ধরনের চিঠি লেখা তো তোমার উচিত হয়নি। কেন লিখেছ?

বড়দা নির্ভয়ে বললো- আজ্ঞে, আমরা উভয় উভয়কে ভালবাসতাম তাই।

কামালদা হঠাৎ চিৎকার করে বললেন—মিথ্যে কথা। একটা মেয়ের নামে মিথ্যে বলতে লজ্জা করে না? মোড়লমশায়, ও নিজেকে বাঁচাতে অপরকে দোষী করছে।

ধমক দিয়ে রুহুল মিঞা বললেন—আপনি থামুন, আমাকে বলতে দিন। হ্যাঁ রফিক, তুমি না হয় রীণাকে ভালবাসতে; কিন্তু রীণার ভালবাসার কোন প্রমাণ আছে কি?

আমি ভাবছিলাম, বড়দা হয়তো এবার রীণার চিঠিগুলো দেখিয়ে দেবে। বেশ জমবে ব্যাপারটা। কিন্তু ঘটলো অন্য ব্যাপার।

বড়দা বললো—না, আমার কোন প্রমাণ নেই। রীণাই একমাত্র প্রমাণ। আপনি রীণাকে জিজ্ঞাসা করুন।

একথা শোনার পর বড়দার উপর শ্রদ্ধা যেন আরও বেড়ে গেল। সত্যি, কত মহৎ, কত বড় ওনার ভালবাসা। ওনার আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস যে এত বিরাট তা জানতুম না।

সভায় রীণাকে ডাকা হল। রুহুল মিঞা রীণাকে জিজ্ঞাসা করলেন—রীণা, তোমাকে একটাই প্রশ্ন করা হবে। খুব ভেবে, চিন্তা করে, সত্য কথা বলবে। মিথ্যে বললে ভবিষ্যতে তোমার ক্ষতি হতে পারে।

—বলুন।

—রফিককে তুমি ভালবাসতে?

বড়দার চোখদুটো তখন রীণাকে ঘিরে। একটা উত্তরের প্রতীক্ষা; যার উপর বড়দার ভবিষ্যৎ। কিন্তু রীণা যখন দৃঢ়কণ্ঠে বললে যে, সে ভালবাসতো না। তখন বড়দার মুখের উপর অন্ধকার নেমে এল। চোখ দুটো মাটিতে নামিয়ে এনে গম্ভীর হয়ে রইলো। চারিদিক থমথম করছে। রুহুল মিঞা বললেন—তোমার আর কিছু বলার আছে রফিক?

—আজ্ঞে না!

রুহুল মিঞা বিচারের রায়ে বললেন—অন্যায়টা তাহলে এক-তরপা। রফিক, কামালদার হাত ধরে মাপ চেয়ে নাও। ভবিষ্যতে এরকম ভুল যেন না হয়।

এত বড় অন্যায়, এত বড় অপমানকে কি করে যে বড়দা সহ্য করলো তা ভেবে পাইনি। শুধু তাই না, বাড়ীতে এসে আব্বার কাছে বেশ কড়াকড়া কথা শুনতে হয়েছে বড়দাকে। আব্বা সেদিন দারুণ দুঃখ পেয়েছিলেন। রাগেতে তিনি বড়দাকে বললেন—আগে জানতাম শিক্ষিতরা বুদ্ধিমান। এখন দেখছি সেটা মিথ্যে। তুমি যে এত মূর্খ, বুদ্ধিহীন তা জানতুম না। শেষে তুমি মুখে চুনকালি মাখালে।

আব্বার এইটুকু কথাই যথেষ্ট ছিল। বড়দা মাথা নীচু করে সমস্ত ব্যথা সহ্য করে নিজের ঘরে ফিরে গেল। সারা রাতটা হয়তো কেঁদেই কেটেছে।

পরের দিন এল এক মহামারী। বৈকালে হঠাৎ বড়দার ঘরে ঢুকতে গিয়ে গ্লাসের ঠুন ঠুন আওয়াজ শুনতে পেলাম। চুপি চুপি দেখি—বড়দা মদ খাচ্ছে। ভাবলাম, মাকে বলে দিই। কিন্তু পরে সব জানাজানি হয়ে গেল। এ নিয়ে আব্বাও একদিন বড়দাকে বোঝালেন। কিন্তু বড়দা শুনলে তো! বড়দা যেন পাথর হয়ে গেছে।

তুমি এসেছ, খুব ভাল হয়েছে। বড়দাকে বাঁচাও সিরাজদা। এভাবে মদ খেলে কতদিন আর বাঁচবে। আমার বড়দাকে তুমি বাঁচাও। ওনার দুঃখ আর সহ্য করা যায় না।

রহিম হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো আমার সামনে। আমার মনের অবস্থাও তদ্রূপ। চোখের কোণে কয়েক কোঁটা পানি জমে গেছে। আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—কেঁদ না রহিম। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার আগমন রফিক হয়তো টের পেয়েছে। চেয়ার থেকে মুখ ঘুরিয়ে বললো, "কে! আরে—এ সিরাজ? আয় আয়।" তার কথা জড়ান। পুরোপুরি মাতালের মতো।

"এ কিরে, তুই মদ খেয়েছিস!" রহিম আমাকে যথার্থই বলেছে।

—খেয়ে…ছি তো কি হয়ে…ছে? তু…ই খা…বি?

—ছি, ছি, তুই শেষে মদ খেলি!

—"ছি—, ছি—, হাঃ, হাঃ, হাঃ…মদ খেলে বুঝি ছি, ছি, বলে! হুঁ…।" ওর গাল থেকে একরাশ মদের গন্ধ বের হয়ে এল।

—জানিস, মদ খাওয়া পাপ।

—তা…ই বুঝি! মদ খেলে পাপ হ…য়! আর কি খেলে পুণ্য হয় বাছাধন। তু…ই আজ পাপ পুণ্য শেখাতে এসেছিস। যত সব। এই পৃথিবীতে সব মিথ্যে, সব পাপ, সব পাপ। তুই আমায় উপদেশ দিতে এসেছিস। বল,…বল, পাপ কি, কে পাপ করে না? কি পারবিনি তো? আমি জানি, আমি জানি তুই পারবিনি। কে…উ পারবে না। কে…এ, রহিম, কি দরকার?

"না, কিছু না। সিরাজদাকে মা ডাকছে, তাই বলতে এলুম।" রহিম বেশী কিছু আর বললো না।

—না, সিরাজকে আমি যেতে দেব না। ও এখানে থাক…বে। গল্প কর…বে। তুই বরং…, না থাক।

রফিকের এহেন ব্যবহারে মনে মনে বেশ ভয় হচ্ছিল আমার। এমতাবস্থায় বেশী কথা না বলাই ভাল। গ্লাস আর মদের বোতলটা সরিয়ে রেখে বললাম—আমি এখন যাইরে রফিক। তুই বড় বেশী খেয়ে ফেলেছিস। একটু বিশ্রাম নে।

—যাবি…, যা…আ। ও…ঘু…ম পাচ্ছে।

রফিক যে এত সহজে আমায় ছেড়ে দেবে আশা করিনি। পরের

দিন সকালেই গেলাম। চাচাজী, চাচীমা অনেক করে বললো, রফিককে বোঝাতে। চাচীমা তো কেঁদেই ফেললো—বাবা সিরাজ, তুমি তো জান, রফিক আমাদের চোখের মণি। চোখের সামনে ও এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, আর মা হয়ে তা সহ্য করবো? না বাবা, সে আমি পারবো না। আজ তো তুমি চলে যাচ্ছ, ওকে একটু বুঝিয়ে বল বাপ আমার। যেন, ঐ ছাই-পাঁশগুলো না খায়।

আমার বলার কিছুই ছিল না। তবুও বললাম—নিশ্চয় বলবো। তুমি অত ভেবো না। ও আমার কথা মোটেই ফেলতে পারবে না। যাই, দেখি কি করছে।

ওর ঘরে ঢুকে বললাম—কিরে, শরীরটা তোর কেমন আছে?

—খুব ভাল, তুই কেমন আছিস বল? গতকালের ব্যবহারে আমি অত্যন্ত লজ্জিত। তুই কিছু মনে করিসনি তো?

কালকের রফিকের সঙ্গে আজকের রফিকের আকাশ পাতাল তফাত। ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমি বললাম—না, না, কি আবার মনে করবো।

—তোর ভয় হয়নি আমাকে ও ভাবে দেখে। রহিম বললো—তুই নাকি বেশীক্ষণ দাঁড়াসনি।

—রহিম বললো বুঝি! আরে ভয় পাব কেন। তুই অপ্রকৃতিস্থ ছিলি, তাই চলে গেলাম। জানিস রফিক, আমার সামনে চাচীমার কি কান্না। কেন এসব খাস বল তো? এসব না খেলে কি তোর হবে না?

—আমি তো সব সময় খাই না। যখন বিষের জ্বালায় মনটা জ্বলতে থাকে, তখন প্রাণ ভরে খাই। বিষে বিষ কেটে যায়। আগে ভাবতাম, মদের ভেতর তৃপ্তি কোথায়? এখন বুঝেছি। আছে, তৃপ্তি না থাকলেও সান্ত্বনা আছে। এটা যে একটা রেমিডি।

—রেমিডি হোক, আর যাই হোক, মদ খাওয়াটা তুই ছাড়।

পৃথিবীতে কত মানুষ কত রকমের কঠিন আঘাত পাচ্ছে, তাই বলে তারা কি তোর মত মদ খাচ্ছে! ভুলে যাওয়ার কি কোন উপায় নেই!

"সে আমি পারবো না সিরাজ। অনেক চেষ্টা করেছি—মদ আমায় খেতেই হবে। তুই কি জানবি, এ বিশ্বাসঘাতক নাজিরের কথা যখন মনে পড়ে, মনে পড়ে যখন ছলনাময়ী রীণাকে; তখন রক্তগুলো টগবগ করে ফুটে ওঠে। সারা শরীরে তখন ভীষণ জ্বালা। এই বিপদে সাহায্য করে কে জানিস? এই মদ। আর তুই বলছিস ছেড়ে দিতে! না সিরাজ একে ছাড়া বড় মুস্কিল।" রফিকের চোখ দুটো কেমন লাল হয়ে ওঠে।

—তুই বরং কিছুদিনের জন্যে ছোটনাগপুরে চল। জায়গাটা বেশ ভাল, তোর খুব ভাল লাগবে। একঘেয়েমী কিছুটা কাটবে। কি, যাবি? আজ বিকেলেই ট্রেন।

"তুই কি মনে করিস, বাইরে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে? না। আচ্ছা, তুই যখন বলছিস চল। কিছু দিনের জন্যে ঘুরেই আসি। বাবা-মা হয়তো একটু সান্ত্বনা পাবে।" রফিক একটু হেসে ফেলে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দুদিন হয়ে গেল, রফিক আমার সাথে ছোটনাগপুরে চলে এসেছে। ছোট্ট এই বাংলোতে আমাদের দুজনের বেশ কেটে যায়। কারখানার ছুটির পর দুই বন্ধুতে বেরিয়ে পড়ি প্রকৃতির রাজ্যে। কখন কোন টিবির উপর, কখনও জলাশয়ের পাশে, কখনও ঐ পাহাড়ের ছোট্ট কোলটাতে কেটে যায় কত সময়। দেখতে দেখতে গোধূলি অবসন্ন হয়ে পড়ে। অদৃশ্যমান হংস বলাকার পানে তাকিয়ে থাকি আমরা দুজনে। আস্তে আস্তে গাছের ফাঁক দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি দেয়। রাত বাড়তে থাকে, শরতের শেষ, হেমন্তের আগমন। তাই একটু শীতও পড়েছে। দু' বন্ধুতে ফিরে যাই আমাদের ডেরায়। দিনগুলো বেশ সুখেই কাটছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে রফিক এত অন্যমনস্ক হয়ে যেত যে, আমি বিরক্ত হতাম। দূরে, যেখানে আকাশ মাটিতে মিশেছে, সেখানকার এক টুকরো কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে রফিক যেন জড় হয়ে যেত। নীরবতা

আমার ভাল লাগতো না। বলতাম—ছোটনাগপুর জায়গাটা কেমন লাগছে, বল!

—চমৎকার! কাশ্মীরের সাথে সামান্য সাদৃশ্য আছে এর।

—বেশ বলেছিস। দেখ, দেখ রফিক, ঝাউগাছটার নীচে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে কি বলছে! প্রেম বিনিময় নয় তো!

রফিক আগে থেকেই ওদিকটা দেখছিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললো—আমি কি করে জানবো? চল, বাসায় চল। শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে।

—সে কিরে, কি হল আবার!

—তুই যাবি কিনা বল। আমি চললুম।

"চল।" ওর কথাতেই বাড়ী চলে এলাম।

পরের দিন কাজ থেকে ফিরে দেখি, রফিক মদ খেয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে আছে।

"তুই আবার মদ খেয়েছিস?" আমার রাগ হল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি খে···য়েছি। বেশ ক···রেছি। আমার বু··ঝি বাঁচার ইচ্ছা যায় না! পৃথিবীতে কি শুধু তোরাই বাঁচবি?

"কে বলেছে বাঁচার সাধ নেই! বেশ তো এক সপ্তাহ আনন্দেই কাটলো। হঠাৎ তোর কি হল যে, আবার—।" ওকে তুলে খাটে বসিয়ে দিই।

—গরল, গরল। আমার কণ্ঠে গরল। বিষে আমি জরে গেছি। বাঁচার আর কোন আশা নেই। বড় কষ্ট হয়। দুঃখ হয়। মনে হয়, এই জীবন? শান্তি খুঁজি আমি এই মদের মধ্যে। এটাও তো গরল। দুঃখ যদি এর মধ্যে থাকতে পারে, শান্তিও নিশ্চয় আছে!

সমবেদনায় মনটা আমার হু-হু করে উঠলো। বললাম—মরীচিকার পেছনে ছুটে কি লাভ রফিক! অদৃষ্টকে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যা হয়ে গেছে তা অতীত। কি হবে অনুশোচনা করে। কে

দেবে এর মূল্য। আমি জানি তোর অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখ। তাই বলে জীবন যুদ্ধে পশ্চাৎ পলায়ন বড় অশোভনীয়, বড় কাপুরুষতা।

নেশার ঘোর রফিকের তখন কিছুটা কেটেছে। চোখ দুটো অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ও বললো—আমি সব জানি, সব বুঝি রে। কিন্তু তবুও নিরুপায়। যখন মদ খাই তখন আমিই কি জানি যে, আমি কেন মদ খাচ্ছি! নিয়তির বিচারে হয়তো এই আমার শাস্তি, এই আমার সাথী। মৃত্যু পর্যন্ত এর মায়া আর কাটাতে পারলুম না দোস্ত! একটু থেমে ও আবার বললো—ভাল কথা, কালকে ভোরের ট্রেনেই আমি বাড়ী ফিরবো। মার জন্যে মনটা বড় কেমন করছে। কতদিন হল মার কাছ থেকে চলে এসেছি।

—তা যাবি ভাল। কিন্তু আমার কথাগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করিস।

আমার গায়ে হাত চাপড়ে মৃদু হেসে রফিক বললো—All right, all right. Let us have meal, come on.

রফিক চলে গেল পরের দিন। বিদায় বেলায় মনে হচ্ছিল, রফিক তো সেই আগের মতই আছে। কোথাও ওর কোন পরিবর্তন নেই। ওর কথায় বেপরোয়া ভাব, মুখে উজ্জ্বল হাসি, চলার তালে ছন্দ, কণ্ঠে সেই মধুর স্বর। ওকে ছাড়তে কিছুতেই মন চাচ্ছিল না। আস্তে আস্তে সময় হয়ে এল। গার্ডের হুইসেল পড়লো। এমনিতে চোখ দুটো ভরে আসছিল।

আমার গায়ে হাত দিয়ে রফিক বললো—আমার বন্ধু হয়ে তুই দুঃখ পাচ্ছিস? হাস, হাস দেখি। তুই এরকম করে থাকলে কিছুতেই আমার যাত্রা শুভ হবে না।

বহুকষ্টে একটু হাসার ভান করলাম মাত্র। ও খুশী হয়ে বললো —বাহঃ, এইতো বন্ধুর মত কাজ। ভাবিসনি, দেখবি, টুপ করে গাড়ীতে বসে কোথা দিয়ে ঝুপ করে তোর কাছে চলে এসেছি। কি, আনন্দ হচ্ছে না ?

—সত্যি বলছিস রফিক, তুই আসবি! কি যে আনন্দ হচ্ছে, কি বলবো তোকে। এতদিন কত মজায় দিনগুলো কাটছিল, এবার বড় ফ াকা ফাঁকা লাগবে।

"ঐ ট্রেন ছাড়লো। তাহলে আসি। বিদায় বন্ধু, বিদায়—।" রফিক ট্রেনে উঠে পড়লো।

প্লাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর চোখ যায়, দেখতে লাগলাম। আস্তে আস্তে অতবড় দানবটা কোথায় কার সাথে মিশে একাকার হয়ে গেল। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল।

নিজের কাজের মধ্যে এমন ভাবে ডুবে গিয়েছিলাম যে, কয়েকটা মাস কোথা দিয়ে পার হয়ে গেছে তা টের পাইনি। সামান্য অবসরে রফিককে কয়েকটা চিঠি দিয়েছি। প্রতিদানে একটা ছোট্ট উত্তর আমি পেয়েছি। এটাই আমার কাছে যথেষ্ট। কিন্তু চিঠির মাঝে শুধু হতাশার সুর, যাতে আশঙ্কা শুধু বেড়েছে। বার বার চিঠিটা পড়েছি, আর ভেবেছি—এমন কেন হল ; চিঠিটার প্রতিটি অক্ষর এখনও আমার সামনে জ্বলজ্বল করছে—।

প্রিয় সিরাজ,

বাড়ী এসে কেবলই ভাবছি, কেন তোকে ছেড়ে এলাম। বেশ কাটছিল তোর ওখানে। এখানে শুধু আলেয়ার আনাগোনা। আত্মা আমার ছুটে চলে তার পিছনে। যখন হাঁফিয়ে উঠি, তখন

আবার সেই রক্তে রাঙা গরলের আশ্রয় নিই। আমি অনোন্যপায়।

জীবনকে সহজভাবেই নিয়েছিলাম। এর ভিতরে অসহজ কিছু থাকতে পারে, এমন চিন্তা করিনি কোনদিন। যে প্রজাপতি বসন্তের পুষ্পোৎসবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, সে কি জানে যে, এমন একদিন আসবে, যেদিন বসন্ত বৌরী গাইবে না, অশোক পলাশ ফুটবে না এবং শীতের নিসাড় শুভ্রতার বৈধব্যের মধ্যে দখিন হাওয়ায় মূর্চ্ছা আর ভাঙবে না! শীত এসেছে আমার মনের মাঝে। তুষারের দীর্ঘশ্বাসে প্রাণ আমার হিম হয়ে গেছে। আমার ভবিষ্যৎ নেই। অতীত আর বর্তমানেই আমার পরিণতি। ব্যতিক্রম তো মানুষের জীবনেই আসে। প্রকৃতির এই মোহনীয় স্বাভাবিক পরিবেশে, আমি অস্বাভাবিক। আমার স্থান নেই। নীল আকাশের নীচে সোনালী পৃথিবীর কচি ঘাসে আমার কিছু নেই। তুই আমার সান্ত্বনা। জীবনে তোর মত বন্ধু ক'জন পায়! আমার ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠুক তোরই মাঝে। আমি যেন নিরাশ না হই। তোর কর্ম-জীবন মধুময় হোক।

তোর প্রাণের,
রফিক

রফিকের এই বক্তব্য কত করুণ তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। চিঠিতে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছি ওকে। কিন্তু এরপর দিন গুনেছি এক, দুই, তিন করে। উত্তর আসেনি।

পয়লা মে, অফিস বন্ধ। হিসাব নিকাশ কাজ কর্ম থেকে আজ ছুটি। বারান্দার এক কোণে ইজিচেয়ারে সকালের কোমল পরিবেশে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। আমার ভৃত্য রামু এসে বললো—এই নিন বাবু, দেশ থেকে আপনার টেলিগ্রাম এসেছে। পিওন দিয়ে গেল।

আমি একটু আশ্চর্য হলাম। রামুর হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে দেখি, কয়েকটা কথা মাত্র—Come sharp, Rafique is ill.

কেমন যেন সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। পায়ের নীচের মাটিটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো। রামু ব্যস্ত হয়ে বললো—বাবু কোন খারাপ খবর বুঝি ?

—হ্যাঁ রামু। তাড়াতাড়ি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দে। দুপুরের ট্রেনেই বাড়ী যেতে হবে।

সারা পথটা অস্থিরতার মাঝেই কেটেছে। চলন্ত ট্রেনের সচল গতি আমার কাছে অচল ঠেকেছে। শুধু একই চিন্তা, কতক্ষণে বাড়ী যাই।

বাড়ী এসে কারও দেখা পেলাম না। বাবা, মা কেউই নেই। ঘরের মধ্যে ছোট ভাইটা খেলছিল। আমায় দেখে বললো—বড়দা, কখন এলে।

আমি চঞ্চল। বললাম—এক্ষণি, আব্বা,মা কোথায় রে?

—সকালবেলা রফিকদাদের বাড়ী গেছে। রফিকদাকে হাস-পাতালে দিয়েছিল।

কয়েকটা মুহূর্তমাত্র। কাপড় না ছেড়েই ছুটলাম রফিকদের বাড়ী। কিন্তু আমার দেরী হয়ে গেছে। চার কাঁধে রফিকের দেহ তখন চলেছে গোরস্থানের মাটির ঘরে। আমি শীতল হয়ে গেলাম। মনে হল আমি বরফ হয়ে জমে গেছি। কোন রকমে একপা একপা করে রফিকদের সদর দরজার কাছে আসতেই রহিম আমাকে জড়িয়ে ধরলো। চোখ দিয়ে তার অঝোরে পানি বের হচ্ছে। পাগলের মত চিৎকার করে বললো—সিরাজদা, রফিকদা আমাদের ছেড়ে চলে গেল ! কেউ পারলো না তাকে ধরে রাখতে!

প্রচণ্ড আঘাতে হিমশৈল তখন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। আমার হৃদয়যন্ত্রকে কে যেন ছিঁড়ে ফেলেছে। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম।

যখন আমার জ্ঞান ফিরলো, তখন দেখি, আব্বা, মা, চাচাজী আমার মাথার কাছে। আমি শুধু একটা কথাই জিজ্ঞাসা করলাম—রফিকের কি হয়েছিল ?

বাবা বললেন—হাই রোডে মটর সাইকেলে যেতে যেতে হঠাৎ লরীর সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লেগে রফিকের ফুস ফুস ফেটে যায়। মাথায়ও প্রচণ্ড আবাত লাগে। তারপর হাসপাতালে দেওয়া হয়।

আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম—না, না, আর বোল না! আমি শুনতে পারবো না!

সবাই আমাকে অনেক বুঝিয়েছিল। আমি জানি না, তখন আমি কি বুঝেছি। কবরের মাঝে রফিকের সাথে আমার শেষ দেখা। সেই দৃষ্টি, সেই হাসি, সেই ইঙ্গীত; কিন্তু সবই তার অব্যক্ত!

"বাবা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছো কেন? মা ডাকছে, ভাত খাবে না?" আমার মেয়ে কাকলীর ডাকে অতীত স্মৃতি হারিয়ে যায়। চোখ মুছে বলি, "চল মা।"

সমাপ্ত